পদ্মা নদীর মাঝি
মানিক বন্দোপাধ্যায়

ভূমিকা

বহির্বিশ্বে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তোড়জোড় তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অস্থিরতা যখন উত্তাল-তরঙ্গময় ঠিক সেই সময় এই শ্রেণী সচেতন, জীবনঘনিষ্ঠ সাহিত্যকর্মে নিবেদিতপ্রাণ লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)-এর জন্ম হয়। তাঁর আসল নাম হচ্ছে প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হিসেবেই তিনি সর্বাধিক পরিচিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় চাকুরি সূত্রে সাঁওতাল পরগনার দুমকায় গমন করেন। এখানেই মানিকের জন্ম হয়; কিন্তু পূর্ববঙ্গের নদীনালা, খালবিল, তেলে-জলেই তিনি মানুষ। তাই ঐ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবনচিত্রকে অপূর্ব দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন তিনি। বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার ভারে নুইয়ে পড়া মানিক পাঠককে তাঁর অভিজ্ঞতার ভাগ দেয়ার জন্যই লেখা শুরু করেন। শ্রেণীবৈষম্য, শোষণ, সামাজিক অসংগতির বিরুদ্ধে শোচ্চার মানিকের মার্কসবাদে দীক্ষা নেয়া জীবনের একটা পর্বান্তর হিসেবে ধরে নেয়া হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৩৫ সাল থেকেই লেখালেখি শুরু করেন। তিনি যখন সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেন তখন ফ্রয়েডীয় মনোবিকার তত্ত্ব সাহিত্যমহলে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর একশ্রেণীর উপন্যাসে বিশাল বিস্তীর্ণ নদ-নদীর পটভূমিকায় সাধারণ মানুষের যেমন বস্তুনিষ্ঠ জীবনচিত্র অঙ্কন করেছেন তেমনি মানুষের কাম-পিপাসার জীবন্ত চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে আদিমতার অন্ধকারে ফিরে গেছেন বারে বারে। অদ্ভুত নিরাসক্তভাবে তিনি মানুষের জীবন ও সমস্যাকে দেখেছেন, সমাধানের চেষ্টাও করেছেন নিজের নিয়মে। নর-নারীর জৈবসত্তা বিকারের নানা দিক লেখককে আকৃষ্ট করেছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে জৈবসত্তা ও দৈহিক বর্ণনায় ছিলেন কিছুটা বে-আব্রু ও বেপরোয়া।

দৈহিকভাবে অসুস্থ হলেও মানসিকভাবে যথেষ্ট বলিষ্ঠ ছিলেন লেখক। সেই বলিষ্ঠতা, রক্তের উষ্ণস্রোত উত্তাপ টের পাওয়া যায় তাঁর গল্প-উপন্যাসের চরিত্রের বর্ণনায়, পেশায়, কাজে-কর্মে। জননী (১৯৩৫), দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫), পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬), পুতুলনাচের ইতিকথা (১৯৩৬), অহিংসা (১৯৪৮), চতুষ্কোণ (১৯৪৩) প্রভৃতি উপন্যাসগুলো পাঠক সাদরে গ্রহণ করেছেন। পাঠকের চেতনাকে নাড়া দিতে পেরেছেন বলেই এগুলো পাঠকের কাছে আদরণীয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষারীতির পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রচলিত সাধু-চলিত রীতির ধার তিনি ধারেননি। চরিত্রের মুখের আঞ্চলিক ভাষার রীতি সাধু না চলিত তা বোঝা কখনো-কখনো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। লেখকের নিজস্ব বর্ণনাও গুরুচণ্ডালী দোষে দুষ্ট। তথাপি যুগ, শ্রেণী পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী উপযুক্ত ভাষার প্রয়োগ মানিকের লেখনীতে মোক্ষম অস্ত্রের মতো কাজ করেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গল্প-উপন্যাসে মানুষকে অতিমানব কিংবা মহামানব করেননি, সাধারণ রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে তুলে ধরেছেন, যার জৈব চাহিদা আছে, কামনা-বাসনা আছে। একই চরিত্রের ভিতরে ভালো ও মন্দ এ-দুটোর সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। এটাই বাস্তবতা, মানিক তা অস্বীকার করেননি। সংসার ও সমাজজীবনে পোড়-খাওয়া মানুষের জীবনের চিত্রণে তিনি শব্দ ও বাক্যের পরতে পরতে তাই কোনো দর্শনতত্ত্বের জাল বোনেননি। আদর্শ নিয়ে মাতামাতি করে সূক্ষ্ম ভাবরসে নিমজ্জিত হতে চাননি। ফলে কোনো কোনো উপন্যাসের চরিত্রের অন্তর্নিহিত মনস্তাত্ত্বিক রূপটি হয়তো বা বিশৃঙ্খল, এলোমেলো হয়ে পড়েছে এবং যা কিছুটা হলেও উপন্যাসের শিল্পরসকে ক্ষুণ্ণ করেছে।

পদ্মানদীর মাঝি

ফ্রয়েড থেকে মার্কসবাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের একটা বড় পরিবর্তন। মার্কসীয় দর্শনের দ্বারা অণুপ্রাণিত হয়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ব্যক্তি-মানুষের জৈব চাহিদা যত সর্বগ্রাসীই হোক না কোন সমাজকে কোনোভাবে অস্বীকার করতে পারে না। তাই কুবের ও কপিলার নতুন সংসার হয়েছিল ময়না দ্বীপে। পদ্মার পটভূমিতে কুবের-কপিলার ভালোবাসা উপন্যাসে কবিত্বময় সৌন্দর্য ছড়িয়েছে। স্ত্রী মালারও অনেক গুণ। তার ত্বকের মসৃণতা কুবেরকে আকৃষ্ট করে, ছেলেকে ভাত খাওয়াতে বসে সে চমৎকার রূপকথা বলে। পঙ্গু বলেই বাহিরের জগতের সঙ্গে তার পরিচয় কম—"জেলে পাড়ার রূঢ় বাস্তবতা তাই তাকে অনেকটা রেহাই দিয়েছে।" অকর্মণ্য পঙ্গু মালার সন্তানবাৎসল্য তাই জেলেপাড়ার ছোঁয়া বাঁচিয়ে উচ্চবিত্ত কিংবা মধ্যবিত্ত পরিবারের কেনো রমণীর ন্যায় নিখুঁত —"চারদিকে অসভ্যতার আবেষ্টনী, অভিনয় সুমার্জিত সভ্যতা।" তবুও মালার শারীরিক পঙ্গুতার মধ্যেই নিহিত ছিল কুবের-কপিলার অবৈধ ভালোবাসার বীজ। এ সমাজ-সংসারে লেখক তাদেরকে জায়গা দিতে পারেননি। কমিউনিজম শুধু রাজনৈতিক জীবনেই নয় শিকড় গেড়েছিল তাঁর পারিবারিক জীবনে, সমাজ জীবনে, রক্তে, মাংসে, চিন্তায়, চেতনায়, মেধা ও মননে। দারিদ্র্যের সাথে যুদ্ধ করে পর্যুদস্ত হয়েও তিনি 'পদ্মানদীর মাঝি'তে হোসেন মিয়ার চোখে স্বপ্ন দেখেছেন নতুন পৃথিবীর, নতুন মানুষের। যেখানে ধনী দরিদ্রের কোনো প্রভেদ নেই, শাসক-শোষণ নেই, মৌলবি পুরুত নেই। সকলে মিলে সেখানে একটি ধর্মপালন করবে— সেটা হচ্ছে মানবধর্ম। লেখক তাঁর স্বপ্নকে সফল করতে গিয়ে হোসেন মিয়ার অবৈধ কারবারকে পর্যন্ত প্রশ্রয় দিয়েছেন। তার অবৈধ কাজগুলোকে পাঠকের কাছ থেকে সযত্নে আড়াল করার চেষ্টা পর্যন্ত করেছেন।

পদ্মার মতো রহস্যময়ী কপিলা কখনো অবাধ্য বাঁশের কঞ্চির মতো নুয়ে পড়েছে কুবেরের দিকে। আবার কখনো সোজা হয়ে সরে গেছে শ্যামা দাসের কাছে,আর দশটা সাধারণ রমণীর মতো গৃহস্থালির কাজ করেছে। পদ্মার গভীরতার মতোই তার মতের তল খুঁজে পাওয়া কুবেরের মতো পাকা মাঝিরও অসাধ্য হয়ে পড়ে। মালা ও কপিলা ছাড়াও

অপ্রধান চরিত্রের মধ্যে যুগীও এ উপন্যাসে নক্ষত্রের ন্যায় দ্যুতি ছড়িয়েছে। শীল বাবুর রক্ষিতা যুগীর হৃদয়ের ভিতের যে দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তরের সন্ধান পাওয়া যায় তাতে উপন্যাসের স্বল্প পরিসর পেলেও পাঠকের হৃদয়ে বৃহৎ আসন দখল করে নেয়।

পদ্মানদীর মাঝি পদ্মার তীরবর্তী জেলেদের জীবনচিত্র। এসব অবহেলিত, বঞ্চিত, শোষিত মানুষগুলোর জীবনবৈচিত্র্য সরলতায়, জটিলতায়, কুটিলতায়, পঙ্কিলতায় পদ্মার মতোই রহস্যময় হয়ে একই সমান্তরালে বয়ে গেছে, বিশ্বসাহিত্যের দরবারে যা অবিস্মরণীয় উৎকর্ষে উজ্জ্বল।

পদ্মানদীর মাঝি

বর্ষার মাঝামাঝি।

পদ্মায় ইলিশ মাছ ধরার মরসুম চলিয়াছে। দিবারাত্রি কোন সময়েই মাছ ধরিবার কামাই নাই। সন্ধ্যার সময় জাহাজঘাটে দাঁড়াইলে দেখা যায় নদীর বুকে শত শত আলো অনির্বাণ জোনাকির মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জেলে-নৌকার আলো ওগুলি। সমস্তরাত্রি আলোগুলি এমনিভাবে নদীবক্ষের রহস্যময় ম্লান অন্ধকারে দুর্বোধ্য সঙ্কেতের মত সঞ্চালিত হয়। এক সময় মাঝরাত্রি পার হইয়া যায়। শহরে, গ্রামে, রেল-স্টেশনে ও জাহাজঘাটে শ্রান্ত মানুষ চোখ বুজিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। শেষরাত্রে ভাঙা-ভাঙা মেঘে ঢাকা আকাশে ক্ষীণ চাঁদটি উঠে। জেলে-নৌকার আলোগুলি তখনো নেভে না। নৌকার খোল ভরিয়া জমিতে থাকে মৃত সাদা ইলিশ মাছ। লণ্ঠনের আলোয় মাছের আঁশ চকচক করে, মাছের নিস্পলক চোখগুলিকে স্বচ্ছ নীলাভ মণির মত দেখায়।

কুবের মাঝি আজ মাছ ধরিতেছিল দেবীগঞ্জের মাইল দেড়েক উজানে। নৌকায় আরও দুজন লোক আছে, ধনঞ্জয় এবং গণেশ। তিনজনের বাড়িই কেতুপুর গ্রামে। আরও দু-মাইল উজানে পদ্মার ধারেই কেতুপুর গ্রাম।

নৌকাটি বেশী বড় নয়। পিছনের দিকে সামান্য একটু ছাউনি আছে। বর্ষা-বাদলে দু-তিনজনে কোনরকমে মাথা গুঁজিয়া থাকিতে পারে। বাকি সবটাই খোলা। মাঝখানে নৌকার পাটাতনে হাত দুই ফাঁক রাখা হইয়াছে। এই ফাঁক দিয়া নৌকার খোলের মধ্যে মাছ ধরিয়া জমা করা হয়। জাল ফেলিবার ব্যবস্থা পাশের দিকে। ত্রিকোণ বাঁশের ফ্রেমে বিপুল পাখার মত জালটি নৌকার পাশে লাগানো আছে। জালের শেষসীমার বাঁশটি নৌকার পার্শ্বদেশের সঙ্গে সমান্তরাল। তার দুই প্রান্ত হইতে লম্বা দুটি বাঁশ নৌকার ধারে আসিয়া মিশিয়া পরস্পরকে অতিক্রম করিয়া নৌকার ভিতরে হাত দুই আগাইয়া আসিয়াছে। জালের এ দুটি হাতল। এই হাতল ধরিয়া জাল উঠানো এবং নামানো হয়।

গভীর জলে বিরাট ঠোঁটের মত দুটি বাঁশে-বাঁধা জাল লাগে। দড়ি ধরিয়া বাঁশের ঠোঁট হাঁ-করা জাল নামাইয়া দেওয়া হয়। মাছ পড়িলে খবর আসে জেলের হাতের দড়ি বাহিয়া, দড়ির দ্বারাই জলের নীচে জালের মুখ বন্ধ করা হয়।

এ নৌকাটি ধনঞ্জয়ের সম্পত্তি। জালটাও তারই। প্রতি রাত্রে যত মাছ ধরা হয় তার অর্ধেক ভাগ ধনঞ্জয়ের, বাকি অর্ধেক কুবের ও গণেশের। নৌকা এবং জালের মালিক বলিয়া ধনঞ্জয় পরিশ্রমও করে কম। আগাগোড়া সে শুধু নৌকার হাল ধরিয়া বসিয়া থাকে। কুবের ও গণেশ হাতল ধরিয়া জালটা জলে নামায় এবং তোলে, মাছগুলি সঞ্চয় করে পদ্মার ঢেউয়ে নৌকা টলমল করিতে থাকে, আলোটা মিটমিট করিয়া জ্বলে, জোর বাতাসেও নৌকার চিরস্থায়ী গাঢ় আঁশটে গন্ধ উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারে না। একহাতে একখানি কাপড়কে নেংটির মত কোমরে জড়াইয়া ক্রমাগত জলে ভিজিয়া, শীতল জলোবাতাসে শীত বোধ করিয়া, বিনিদ্র আরক্ত চোখে লণ্ঠনের মৃদু আলোয় নদীর অশান্ত জলরাশির দিকে চাহিয়া থাকিয়া কুবের ও গণেশ সমস্ত রাত মাছ ধরে। নৌকা স্রোতে ভাসিয়া যায়। বৈঠা ধরিয়া নৌকাকে তারা ঠেলিয়া লইয়া আসে সেইখানে যেখানে একবার একেবারে ঝাঁকের মধ্যে জাল ফেলিয়া বেশী মাছ উঠিয়াছিল। আজ খুব মাছ উঠিতেছিল। কিন্তু ভোরে দেবীগঞ্জে মাছের দর না জানা অবধি এটা সৌভাগ্য কিনা বলা যায় না। সকলেরই যদি এ রকম মাছ পড়ে দর কাল এত নামিয়া যাইবে যে বিশেষ কোন লাভের আশা থাকিবে না। তবে মাছের বড় ঝাঁক একই সময়ে সমস্ত নদীটা জুড়িয়া থাকে না, এই যা ভরসার কথা। বেশী মাছ সকলের নাও উঠিতে পারে।

কুবের হাঁকিয়া বলে, যদু হে এ এ এ মাছ কিবা?

খানিক দূরের নৌকা হইতে জবাব আসে, জবর।

জবরের পর সে নৌকা হইতে পালটা প্রশ্ন করা হয়। কুবের হাঁকিয়া জানায় তাদের মাছ পড়িতেছে জবর।

ধনঞ্জয় বলে, সাঁঝের দরটা জিগা দেখি কুবের।

কুবের হাঁকিয়া দাম জিজ্ঞাসা করে। সন্ধ্যাবেলা আজ পৌনে পাঁচ, পাঁচ, এবং সওয়া পাঁচ টাকা দরে মাছ বিক্রি হইয়াছে। শুনিয়া ধনঞ্জয় বলে, কাইল চাইরে নামবে? হালার মাছ ধইরা জুত নাই।

কুবের কিছু বলে না। ঝপ্ করিয়া জাল জলে ফেলিয়া দেয়।

শরীটা আজ তাহার ভাল ছিল না। তার স্ত্রী মালা তাকে বাহির হইতে বারণ করিয়াছিল। কিন্তু শরীরের দিকে তাকাইবার অবসর কুবেরের নাই। টাকার অভাবে অখিল সাহার পুকুরটা এবারও সে জমা লইতে পারে নাই। সারাটা বছর তাকে পদ্মার মাছের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে। এ নির্ভরও বিশেষ জোরালো নয়, পদ্মার মাছ ধরিবার উপযুক্ত জাল তার নাই। ধনঞ্জয় অথবা নড়াইলের যদুর সঙ্গে সমস্ত বছর তাকে এমনি ভাবে দু-আনা চার-আনা ভাগে মজুরি খাটিতে হইবে। ইলিশের মরসুম ফুরাইলে বিপুলা পদ্মা কৃপণ হইয়া যায়। নিজের বিরাট বিস্তৃতির মাঝে কোনখানে যে সে তার মীনসন্তানগুলিকে লুকাইয়া ফেলে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। নদীর মালিককে খাজনা দিয়া হাজার টাকা দামের জাল যারা পাতিতে পারে তাদের স্থান ছাড়িয়া দিয়া, এতবড় পদ্মার বুকে জীবিকা অর্জন করা তার মত গরীব জেলের পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার। ধনঞ্জয় ও যদুর জোড়াতাড়ি-দেওয়া ব্যবস্থায় যে মাছ পড়ে তার দু'তিন আনা ভাগে কারো সংসার চলে না। উপার্জন যা হয় এ ইলিশের মরশুমে। শরীর থাক আর যাক, এ সময় একটা রাত্রেও ঘরে বসিয়া থাকিলে কুবেরের চলিবে না।

মাঝরাত্রে একবার তারা খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছে। রাত্রি শেষ হইয়া আসিলে কুবের বলিল, এক্টু জিরাই গো আজান খুড়া।

জিরানের লাইগা মরস ক্যান ক দেখি? বাড়িত্ গিয়া সারডা দিন জিরাইস। আর দুই খেপ দিয়া ল।

কুবের বলিল, উঁহু, তামুক বিনা গায়ে সাড় লাগে না। দেহখানা জান গো আজান খুড়া, আইজ বিশেষ ভাল লাই।

জাল উঁচু করিয়া রাখিয়া কুবের ও গণেশ ছই-এর সামনে বসিল। ছইয়ের গায়ে আটকানো ছোট হুঁকাটি নামাইয়া টিনের কৌটা হইতে কড়া দা-কাটা তামাক বাহির করিয়া দেড় বছর ধরিয়া ব্যবহৃত পুরাতন কল্কেটিতে তামাক সাজিল কুবের। নারিকেল-ছোবড়া গোল করিয়া পাকাইয়া ছাউনির আড়ালে একটিমাত্র দেশলাইয়ের কাঠি খরচা-করিয়া সেটি ধরাইয়া ফেলিল। বারো বছর বয়স হইতে অভ্যাস করিয়া হাত একেবারে পাকিয়া গিয়াছে।

নৌকা স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছিল।

একহাতে তীরের দিকে কোণাকুণি হাল ধরিয়া ধনঞ্জয় অন্য হাতটি বাড়াইয়া দিয়া বলিল, দে কুবের, আমারে দে, ধরাই।

কলিকাটা তাহার হাতে দিয়া কুবের রাগ করিয়া বসিয়া রহিল।

কুবেরের পাশে বসিয়া গণেশ বাড়াবাড়ি রকমের কাঁপিতেছিল। এ যেন সত্যসত্যই শীতকাল।

হঠাৎ সে বলিল, ইঃ আজ কি জাড় কুবির।

কথাটা কেহ কানে তুলিল না। কারো সাড়া না পাইয়া কুবেরের হাঁটুতে একটা খোঁচা দিয়া গণেশ আব্বার বলিল, কুবির আইজকার জাড়ে কাঁইপা মরলাম।

এদের মধ্যে গণেশ একটু বোকা। মনের ক্রিয়াগুলি তার অত্যন্ত শ্লথ গতিতে সম্পন্ন হয়।

সে কোন কথা বলিলে লোকে যে তাহাকে অবহেলা করিয়াই কথা কানে তোলে না এটুকুও সে বুঝিতে পারে না। একটা কিছু জবাব না পাওয়া পর্যন্ত বারবার নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করে। ধমকের মত করিয়া যদি কেউ তার কথার জবাব দেয় তাতেও সে রাগ করে না। দুঃখও তাহার হয় কিনা সন্দেহ।

কুবেরের সে অত্যন্ত অনুগত। জীবনের ছোটবড় সকল ব্যাপার সে কুবেরের পরামর্শ লইয়া চলে। বিপদে আপদে ছুটিয়া আসে তাহারই কাছে। এক পক্ষের এক আনুগত্যের জন্য তাহাদের মধ্যে যে বন্ধুত্বটি স্থাপিত হইয়াছে তাহাকে ঘনিষ্ঠই বলিতে হয়। দাবি আছে, প্রত্যাশা আছে, সুখ-দুঃখের ভাগাভাগি আছে, কলহ এবং পুনর্মিলনও আছে। কিন্তু গনেশ অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির বলিয়া ঝগড়া হয় খুব কম।

পুড়িয়া শেষ হওয়া অবধি তাহারা পালা করিয়া তামাক টানিল। নৌকা এখন অনেক দূরে আগাইয়া আসিয়াছে। কলিকার ছাই জলে ঝাড়িয়া ফেলিয়া হুঁকাটি ছইয়ে টাঙাইয়া দিয়া জাল নামাইয়া কুবের ও গণেশ বৈঠা ধরিল।

গণেশ হঠাৎ মিনতি করিয়া বলিল, একখান গীত ক দেখি কুবির।

হু, গীত না তর মাথা।

কুবেরের ধমক খাইয়া গণেশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর নিজেই ধরিয়া দিল গান। সে গাহিতে পারে না। কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। ধনঞ্জয় ও কুবের মন দিয়া গানের কথাগুলি শুনে। সে যাহারে ভালবাসে সে তাহারে পায় না কেন, গানে এ গভীর সমস্যার কথা আছে। বড় সহজ নয়।

পূর্বদিক লাল হইয়া উঠা পর্যন্ত তাহারা জাল ফেলিয়া বেড়াইল। তারপর রওনা হইল জাহাজঘাটের দিকে। সেইখানে পৌছিতে পৌছিতে চারিদিক আলো হইয়া উঠিল।

নদীর তীরে, নদীর জলে এখন জীবনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। থাকিয়া স্টীমারের বাঁশি বাজিয়া উঠে। সশব্দে নোঙর তুলিয়া কোন স্টীমার ছাড়িয়া যায়, কোন স্টীমার ভিড়ে গিয়া জেটিতে। কলকাতা হইতে ট্রেনটি আসিয়া পড়িয়াছে। ঘাটের ও স্টেশনের দোকানপাট সমস্ত খোলা হইয়াছে। অনেকে নদীর জলে স্নান করিতে নামিয়াছে। মোটরবাহী ও যাত্রীবাহী অসংখ্য ছোটবড় নৌকা ঘাটে ভিড় করিয়া আসিয়াছে। ঘাটের দিকে বহুদূর অবধি তীর ঘেষিয়া কাদায় পোঁতা লগির সঙ্গে বাঁধা আরও যে কত নৌকা তার সংখ্যা নাই। নদীতে শুধু জলের স্রোত। জলে স্থলে মানুষের অবিরাম জীবনপ্রবাহ।

মেছো নৌকোর ঘাটটি একপাশে। ইতিমধ্যে অনেকগুলি নৌকা মাছ লইয়া হাজির হইয়াছে। হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকিতে স্থানটি হইয়অ উঠিয়াছে সরগরম। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে দরাদরি সম্পন্ন হইয়া হরদম মাছ কেনাবেচা চরিতেছে। চালানের ব্যবস্থাও হইতেছে সঙ্গে সঙ্গেই।

এই ব্যবস্থা ও কোলাহলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া সমস্ত রাত্রিব্যাপী পরিশ্রমের ক্লান্তি ভুলিয়া কুবের খুশী হইয়া উঠে। আজ সে একেবারে ঝিমাইয়া পড়িয়াছিল। শেষরাত্রির দিকে শীত করিয়া বোধহয় তাহার জ্বরই আসিয়াছে। চোখ দুটো যে তাহার ভয়ানক লাল হইয়া উঠিয়াছে গণেশ তাহা দেখিতে পাইয়া বলিয়াছে চার-পাঁচবারের বেশী।

নেংটি ছাড়িয়া তিনহাতি ছোট ময়লা কাপড়খানি পরিয়া কুবের তীরে উঠিল। কাদার মধ্যেই একটা লোহার চেয়ার ও কাঠের টেবিল পাতিয়া চালানবাবু কেদারনাথ মাছ গোনা দেখিয়া খাতায় লিখিয়া যাইতেছে। একশ মাছ গোনা হইবা মাত্র তার চাকরটা ছোঁ মারিয়া চালানবাবুর চাঁদা পাঁচটা ওয়াগন দাঁড়াইয়া আছে। মাছে বোঝাই হইয়া যথাসময়ে ওয়ানগনগুলি কলিকাতায় পৌছবে। সকালে বিকালে বাজারে ইলিশ কিনিয়া কলিকাতার মানুষ ফিরিবে বাড়ি। কলিকাতার বাতাসে পাওয়া যাইবে পদ্মার ইলিশ মাছ ভাজার বন্ধ।

একটা ওয়াগনের আড়ালে দাঁড়াইয়া লম্বা শার্ট গায়ে বেঁটেও মোটা এক ব্যক্তি অনেকক্ষণ

হইতে কুবেরের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছিল। কুবের তাহার দিকে চাহিতেই সে হাতছানি দিয়া ডাকিল।

কুবের খানিকক্ষণ নড়িল না। উদাসভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর কাছে গিয়া বলিল, কী কন?

সে রাগ করিয়া বলিল, কী কন! কী জানস না? মাছ লইয়া আয়। তিনডা আনিস।

মাছ ত নাই শেতলবাবু।

নাই কি রে, নাই? রোজ আমারে মাছ দেওনের কথা না তর? নিয়ে আয় গা, যা। বড় দেইখা আনিস।

কুবের মাথা নাড়িল, আইজ পারুম না শেতলবাবু। আজন খুড়া সিদা মোর দিকে চাহিয়া রইছে দেখ না? বাজারে কেনো গো আইজ।

কিন্তু কুবের চুরি করিয়া যে দামে মাছ দেয় বাজারে কিনিতে গেলে তার দ্বিগুণ দাম পড়িবে। শীতল তাই হঠাৎ আশা ছাড়িতে পারিল না।

সে মিনতি করিয়া বলিল, তিনডা মাছ আইজ তুই দে কুবের। অমন করস ক্যান? পয়সা নয় কয়ডা বেশীই লইস, আঁই?

তালি খানিক দাঁড়াও শেতলবাবু।

কুবের ফিরিয়া গিয়া কাপড়টা ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া নৌকায় বসিল। চারিদিকে চেনা লোক কম নয়। চুপিচুপি মাছ লইয়া তাহাকে তীরে উঠিতে দেখিলে নিশ্চয় সন্দেহ করিবে। লজ্জার তাহার সমা থাকিবে না! তবে একটা ভরসার কথা এই যে সকলেই নিরতিশয় ব্যস্ত। নিজের নৌকা হইতে কে কোথায় দুটো মাছ চুরি করিতেছে তাকাইয়া দেখিবার অবসরই কাহারো নাই। চারিদিকে নজর রাখিয়া তিনটি মাছ কুবের একসময় কাপড়ের তলে লুকাইয়া ফেলিল। তীরে উঠিয়া শীতলের হাতে দিতেই মাছ কটা সে চটের থলির মধ্যে পুরিয়া ফেলিল।

পয়সা কাইল দিমু কুবের।

বলিয়া সে চলিয়া যায়, কুবেরও সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়াইয়া বলিল, রন শেতলবাবু, অমন ত্বরা কইরা যাইবেন না। দামটা দ্যান দেখি।

কাইল দিমু কইলাম যে?

অঁই, অখন দ্যান। খামু না? পোলাগো খাওয়ামু না?

পয়সা নাই ত দিমু কী? কাল দিমু, নিয্যাস দিমু।

পিছল নরম মাটিতে পায়ের বুড়ো আঙুল গাঁথিয়া গাঁথিয়া শীতল চলিয়া গেল। আরক্ত চোখে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া অস্ফুটস্বরে কুবের বলিল, হালা ডাকাইত! বিড়বিড় করিয়া শীতলকে আরও কয়টা গাল দিয়া গলুয়ের দিকে গা এলাইয়া শুইয়া পড়িল।

গণেশটা বোকা। মাছের দাম বুঝিয়া পাওয়ার সময় একটু চেষ্টা করিয়াই ধনঞ্জয় তাহাকে সরাইয়া দিতে পারিয়াছিল; একা একা দাম লইবার সুযোগ সে কোনদিনই পায় না। কুবের এই সময়টা জোঁকের মত তাহার সঙ্গে লাগিয়া থাকে। পাকা পাওয়া মাত্র সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভাগটা বুঝিয়া লয়।

ধনঞ্জয় নৌকায় আসিলে মাথা উঁচু করিয়া কুবের জিজ্ঞাসা করিল, কতটি মাছ হইল আজান খুড়া? শ-চারেক কম না অ্যাঁ?

ধনঞ্জয় মুখে একটা অবজ্ঞাসূচক শব্দ করিয়া বলিল হু, চাইরশ না হাজার, দুইশ সাতাপঞ্চাশখান মাছ। সাতটা ফাউ নিয়া আড়াইশর দাম দিছে।

কুবের উঠিয়া বসিল।

ইটা কী কও খুড়া? কাইল যে এক্কেরে মাছ পড়ে নাই, কাইল না দুইশ সাতাইশটা মাছ হইছিল?

ধনঞ্জয় তৎক্ষণাৎ রাগ করিয়া বলিল, মিছা কইলাম নাকিরে কুবির? জিগাইস না, গণেশ

যাইলে জিগাইস।

কুবের নরম হইয়া বলিল, জিগানের কাম কী? তা কই নাই খুড়া। মিছা কওনের মানুষ তুমি না! মাছ নি কাল বেশী বেশী পড়ছিল তাই ভাবলাম তোমাকে বুঝি চালানবাবু ঠকাইছে।

ঘুমে ও শ্রান্তিতে কুবেরের চোখ দুটি বুজিয়া আসিতে চায় আর সেই নিমীলন-পিপাসু চোখে রাগে দুঃখে আসিতে চায় জল। গরিবের মধ্যে সে গরিব, ছোটলোকের মধ্যে আরও বেশী ছোটলোক। এমনভাবে তাহাকে বঞ্চিত করিবার অধিকারটা সকলে তাই প্রথার মত, সামাজিক ও ধর্মসম্পর্কীয় দশটা নিয়মের মত, অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছে। প্রতিবাদ করিতে পারিবে না। মনে মনে সকলেই যাহা জানে মুখ ফুটিয়া তাহা বলিবার অধিকার তাহার নাই।

গণেশকে ধনঞ্জয় চিড়া কিনিতে পাইয়াছিল। সে ফিরিয়া আসিলে নৌকা খুলিয়া দেওয়া হইল। এখন বৈঠা ধরিলে চলে। উজান স্রোতের টানে নৌকা আপনি গ্রামের দিকে ভাসিয়া চলিবে। গণেশ ও ধনঞ্জয় গুড় মুখে দিয়া শুকনা চিড়া চিবাইতে লাগিল। কুবের কিছু খাইল না। কেবল কয়েক আঁজলা নদীর জল পান করিল। নদীর বুক জুড়িয়া এখন ভাঙা ঢেউগুলির মাথায় অসংখ্য সূর্য জ্বলিয়া উঠিতেছে। কাকচিল মাছরাঙা পাখিগুলি ক্রমাগত জলে ঝাঁপাইয়া মাছা ধরিতেছে। অনেক দূরে অস্পষ্ট মত একটি স্টিমারের ধোঁয়া চোখে পড়ে। আকাশ উজ্জ্বল ও নির্মল। মেঘের চিহ্নও নাই।

গণেশ সহসা মমতা বোধ করিয়া বলে, না আইলি পারতি কুবির আইজ। কুবের কোন জবাব দেয় না। নিঃশব্দে থাকে।

গণেশ বলে, মাথাটা দিমু নাকি?

কুবের বলে, মাথাটা টিপা দিমু নাকি?

কুবের বলে, অঁ হঁ।

গণেশ খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলে, হাল লইয়া যদি যাইবার পারস কুবের আর আমি বৈঠা বাই, তাড়াতাড়ি পৌছান যায়।

পূর্বদিকে গ্রামের বাহিরে জেলে পাড়া। চারদিক ফাঁকা জায়গার অন্ত নাই। কিন্তু জেলেপাড়ায় বাড়িগুলি গায়ে গায়ে ঘেঁষিয়া জমাট বাঁধিয়া আছে। প্রথম দেখিলে মনে হয় এ বুঝি তাদের অনাবশ্যক সংকীর্ণতা, উন্মুক্ত উদার পৃথিবীতে দরিদ্র মানুষগুলি নিজেদের প্রবঞ্চনা করিতেছে। তারপর ভাবিয়া দেখিলে ব্যাপারটা বুঝিতে পারা যায়। স্থানের অভাব এ জগতে নাই। তবু মাথা গুজিবার ঠাঁই এদের ওইটুকুই সমতল ভূমিতে ভূস্বামীর অধিকার বিস্তৃত হইয়া আছে, তাহাকে ঠেলিয়া জেলেপাড়ার পরিসর বাড়িতে পায় না। একটি কুঁড়ের আনাচে-কানাচে তারই নির্ধারিত কম খাজনার জমিটুকুতে আরেকটি কুঁড়ে উঠিতে পায়। পুরুষানুক্রমে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। তারই ফলে জেলে-পাড়াটি জমজমাট।

দিন কাটিয়া যায়। জীবন অতিবাহিত হয়। ঋতুচক্রে সময় পাক খায়, পদ্মার ভাঙন-ধরা তীরে মাটি ধ্বসিতে থাকে, পদ্মার বুকে জল ভেধ করিয়া জাগিয়া উঠে চর, অর্ধ শতাব্দীর বিস্তীর্ণ চর পদ্মার জলে আবার বিলীন হইয়া যায়। জেলেপাড়ার ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনদিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধার্তৃষ্ণার দেবতা, হাসিকান্নার দেবত, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনদিন সাঙ্গ হয় না। এ-দিক গ্রামের ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ভদ্রমানুষগুলি তাহাদের দূরে ঠেলিয়া রাখি, ওদিকে প্রকৃতির কালবৈশাখী তাহাদের ধ্বংস করিতে চায়, বর্ষার জল ঘরে ঢোকে, শীতের আঘাত হাড়ে গিয়া বাজে কনকন। আসে রোগ, আশে শোক। টিকিয়া থাকার নির্মম অনমনীয় প্রয়োজন নিজেদের মধ্যে রেষারেষি করিয়া তাহারা হয়রান হয়। জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষন্ন। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ সঙ্কীর্ণতায়। আর দেশী মদে। তালের রস গাঁজিয়া যে মদ হয়। ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

পদ্মা ও পদ্মার খালগুলি ইহাদের অধিকাংশের উপজীবিকা। কেহ মাছ ধরে, কেহ

মাঝিগিরি করে। কুবের মত কেহ জাল ফেলিয়া বেড়ায় খাস পদ্মার বুকে, কুড়োজাল লইয়া কেউ খালে দিন কাটায়। নৌকার যাহারা মাঝি, যাত্রী লইয়া মাল বোঝাই দিয়া পদ্মায় তাহারা সুদীর্ঘ পাড়ি জমায়, এ গাঁয়ের মানুষকে ও-গাঁয়ে পৌঁছাইয়া দেয়। এ জলের দেশ। বর্ষাকালে চারিদিক জলে জলময় হইয়া যায়। প্রত্যেক বছর কয়েকটা দিনের জন্য এই সময়ে মানুষের বাড়িঘর আর উঁচু জমিগুলি ছাড়া সারাটা দেশ জলে ডুবিয়া থাকে। জল যেবার বেশী হয় মানুষের বাড়ির উঠানও সেবার রেহাই পায় না। পথ ঘাটের চিহ্নও থাকে না। এবার গ্রামে এ-পাড়া হইতে ও-পাড়ায় যাইতে প্রয়োজন হয় নৌকায়। কয়েকদিন পরে জল কমিয়া যায়, জলের ভিতর হইতে পথগুলি স্থানে স্থানে উঁকি দিতে আরম্ভ করে, কিন্তু আরও একমাসের মধ্যে পথগুলি ব্যবহার করা চলে না। যানবাহন এ দেশে একরকম নাই। মানুষের সম্বল নৌকা। উঠিতে বসিতে সকলের নৌকার দরকার হয়।

নৌকার প্রয়োজন কমে সেই শীতের শেষে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে। খালে তখন জল থাকে না, মাঠে জলের বদলে থাকে ফসল অথবা ফসল কাটা রিক্ততা। মানুষ মাঠের আলে হাঁটিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যায়।

নৌকা চলে পদ্মায়। পদ্মা তো কখনও শুকায় না। কবে ও নদীর সৃষ্টি হইয়াছে কে জানে। সমুদ্রগামী জলপ্রবাহের আজও মুহূর্তের বিরাম নাই। গতিশীল জলতলে পদ্মার মাটির বুক কেহ কোনদিন দেখে নাই, চিরকাল গোপন হইয়া আছে।

জেলেপাড়া নদী হইতে বেশীদূর নয়। তবু এইটুকু পথ চলিতেছে কুবেরের কষ্ট হইতেছিল। নৌকার সমস্ত পথটা আবোল তাবোল বকিয়া গণেশ এতক্ষণে চুপ করিয়াছে? ধনঞ্জয় নৌকা হইতে নামে নাই। পাশে কুটুম্ববাড়িতে তাহার কী প্রয়োজন ছিল। নৌকা নৌকা লইয়া সে একই সেখানে চলি গিয়াছে।

গনেশের বাড়িটাই পড়ে আসে। সে বাড়িতে ঢুকিল না। অসুস্থ কুবেরের সঙ্গে আগাইয়া চলিল।

নকুল দাস ঘরের দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছিল। কুবেরকে দেখিতে পাইল ডাকিল বলিল, অ কুবির শুইয়া যা।

গণেশ বলিল, কুবির জ্বরে বড় কাতর গো।

নকুল বলিল, জ্বর নাকি? তবে যা বাড়িতে যা। দ্যাখ গিয়া বাড়িতে কী কাণ্ড হইয়া আছে।

এমন কথা শুনিয়া ব্যাপারটা না জানিয়া যাওয়া চলে না। কুবের উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, কিসের কাণ্ড নকুলদা?

শ্যাষ রাইতে তর বৌ খালাস হইছে কুবির।

কুবের অবাক হইয়া বলিল, হ? নয় মাস পুইরা যে মাত্র কয়টা দিনগেছে নকুলদা। ইটা হইল কিবা?

ক্যান? নয় মাসে খালাস হয় না?

গণেশ জিজ্ঞাসা করিল, পুরুষ ছাওয়াল হইছে না?

নকুল সায় দিয়া বলিল, হ। আমাগের পাচী গেছিল, আইসা কয় কি কুবেরের ঘরে নি রাজপুত্তর আইছে বাবা, ওই একরাত্তি একখানা পোলা, তার চাঁদপানা মুখের কথা কী কমু। রঙ হইছে গোরা।

কুবেরের স্তিমিত চোখ দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নকুল শয়তানি হাসি হাসিয়া পরিহাস করিয়া বলিল, তুইত দেখি কালাকুষ্ঠি কুবির, গোরচাঁদ আইল কোয়ান থেইকা? ঘরে ত থাকস না রাইতে, কিছু কওন যায় বাপু।

গণেশ রাগিয়া বলিল, বৌ গোরা না নকুলদা?

হ, বৌ ত গোরাই, হ।

এর বাড়ির পিছন দিয়া ওর বাড়ির উঠান দিয়া কুবের ও গণেশ এবার জোরে জোরে পা

ফেরিয়াই বাড়ির দিকে আগাইয়া গেল। গণেশ ভারী খুশী। বার বার সে বলিতে লাগিল, পোলা হইব কই নাই কুবির? কই নাই ইবার তর পোলা না হইয়া যায় না?

শেষে বিরক্ত হইয়া কুবের বলিল, চুপ যা গনেশ। পোলা দিয়া করুম কি? নিজেগোর খাওন জোটে না, পোলা!

গণেশ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, তুই নি গোসা করিস কুবির?

করুম না? মইরবার কস নাকি আমারে তুই?

তাহার মেজাজের এই আকস্মিক উত্তাপ গণেশের কাছে বড়ই দুর্বোধ্য ঠেকিল। অত তাহার ভবিষ্যতের কথা ভাবিবার, হিসাব করিবার ক্ষমতা নাই! বৌ থাকিলে মাঝে মাঝে ছেলেমেয়ে হয় এই পর্যন্ত সে জানে, সুবিধা অসুবিধার কথাটা ভাবিয়া দেখে না। তা ছাড়া পৃথিবীতে মানুষ আসিলে খাওয়ানোর দায়িত্ব যে মানুষের নয়, যিনি জীব দেন তাঁর, গণেশ এটা বিশ্বাস করে। সুতরাং ছেলে হওয়ার সংবাদে কুবেরের রাগ করিবার কী কারণ আছে সে ভাবিয়া পাইল না। ভাবিবার চেষ্টাও করিল না।

বেড়া-দেওয়া ছোট একটি উঠানের দুদিকে দুখানা ঘর, কুবেরের বাড়ির এর বেশী পরিচয় নাই। এদিকে ঘরের সঙ্কীর্ণ দাওয়া একটা ছেঁড়া মাদুর চট প্রভৃতি দিয়াও ঘেরিয়া লওয়া হইয়াছে। চাহিলেই বুঝিতে পারা যায় ওটি আঁতুড়ঘর। কারণ চটের ফাঁক দিয়া ভিতরে শায়িতা মালাকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

কুবের ওদিকের দাওয়া-বিহিন ঘরটিতে ঢুকিয়া পড়িল। বাহিরে বর্ষার আকাশে কড়া রোদ উঠিলেও জানালা-দরজার বিশেষ ব্যবস্থা না থাকায় এ ঘরের ভিতরটা একটু অন্ধকার। কোণার দিকে রক্ষিত জিনিসগুলি চিনিতে হইলে ঠাহর করিয়া দেখিতে হয়। ঘরের একদিকে মাটিতে পোঁতা মোটা বাঁশের পায়ের চৌকি-সমান উঁচু বাঁশের পাতা-বিছানো মাচা। মাচার অর্ধেক জুড়িয়া ছেঁড়া কাঁথার বিছানা। তৈলচিক্কণ কালো বালিশটি মাথায় দিয়া কুবেরের পিসী এই বিছানায় শয়ন করে। মাচার বাকি অংশটা হাঁড়িকলসীতে পরিপূর্ণ। নানা আকারের এতগুলি হাঁড়িকলসী কুবেরের জীবনে সঞ্চিত হয় নাই, তিন পুরুষ ধরিয়া জমিয়াছে। মাচার নীচেটা পুরাতন জীর্ণ তক্তায় বোঝাই। কুবেরের বাপের আমলের একটা নৌকা বার বার সারাই করিয়া এবং চালানোর সময় ক্রমাগত জল সেঁচিয়া বছর চারেক আগে পর্যন্ত ব্যবহার করা গিয়াছিল, তারপর একেবারে ও ব্যবহারের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ায়, ভাঙিয়া ফেলিয়া তক্তাগুলি জমাইয়া রাখা হইয়াছে। ঘরের অন্যদিকে ছোট একটা ঢেঁকি। ঢেঁকিটি কুবেরের বাবা হারাধন নিজে তৈয়ারী করিয়াছিল। কাঠ সে পাইয়াছিল পদ্মায়। নদীর জলে ভাসিয়া আসা কাঠ সহজে কেহ ঘরে তোলে না, কার চিতা রচনার প্রয়োজনে ও কাঠ নদীতে আনা হইয়াছিল কে বলিতে পারে? শবের মত চিতার আগুনের জড়তম সমিধরটিও মানুষের ঘরে স্থান নাই! কিন্তু এই ঢেঁকির কাঠটির ইতিহাস স্বতন্ত্র। কুবের তখন ছোট, পদ্মানদীর মাঝির ছেলে যতটুকু বয়সে পদ্মায় সাঁতার দিবার মত পাকা সাঁতারু হইয়া উঠিতে পারে না, তত ছোট। ছোট একটি নৌকায় ছেলেকে সঙ্গে করিয়া হারাধন পদ্মা পার হইতেছিল। নদীর মাঝামাঝি পুরানো নৌকার তলাটা কি করিয়া ফাঁসিয়া যায়। তখন আশ্বিন মাস, সেখানে পদ্মার এ-তীরের ও-তীরের ব্যবধান তিন মাইলের কম নয়। পদ্মা যাহাকে বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে পদ্মার বুকে যত ঢেউ থাক মাইল দেড়েক সাঁতার দিয়া তীরে উঠা তার পক্ষে কষ্টকর কিন্তু অসম্ভব নয়। হারাধন একা হইলে ভাবনা ছিল না। কুবের আর একটু বড় এবং শক্ত-সামর্থ হইলে ও সে বিপদে পড়িত না, কিন্তু ছেলে-মানুষ কুবের ভয় পাইয়া সাঁতার দিতে চাহে নাই, দিশেহারা হইয়া ক্রমাগত হারাধনকে জড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তখন যে লম্বা কাঠের গুঁড়ির হাতের কাছে আড়াইয়া আসিয়া তাহাদের বাঁচাইয়া দিয়াছিল, হয়তো তাহা চিতা রচনার জন্যই কেহ শ্মশানে আনিয়াছিল। হারাধন কিন্তু কাঠটি ফেলিয়া দিতে পারে নাই, ঘরের আসবাবে পরিণত করিয়া দিয়া সাদরে গৃহে স্থান দিয়াছে।

কুবেরের পিসী আর তার বড় মেয়ে গোপী কুবেরকে দেখিয়াই চেচাঁমেচি করিয়া কাছে আসিয়াছিল। কুবের কারো সঙ্গে কথা বলিল না। লম্বা হইয়া পিসীর বিছানায় শুইয়া পড়িলইপসী বলিল, শুলি যে ধন? বৌ ওদিকে পোলা বিষয়াইয়া সারছে, দেইখা আয়। গোপী বলিল, বাই উ ওই বাবুগোর পোলার নাখান ধলা হইঁয়াছে বাবা। নকুলের মাইয়া পাচী কী কইয়া গেল শুনবা? সায়েবগো এমন হয় না। পিসী?

কুবের চেঁচাইয়া ধমক দিয়া বলিল, নকুইলা কি লোক হারামজাদী। জ্যাঠা কইবার পার না?

গোপী মুখ ভার করিয়া বলিল, ক্যান কমু জ্যাঠা? বজ্জাতটা আমারে যা মুখে লয় কয় না?

কী কয়?

রাইত কইরা মাইজাবাবু নি আমাগো বাড়ি, আহে তাই জিগায়। ইবার জিগাইলে একদলা পাঁক দিমুনে ছুইড়া মুখের মধ্যে।

দিস্ বলিয়া কুবের ঝিমাইতে থাকে। খানিক পরে কুবেরের দাওয়া হইতে শিশুর জোরালো কান্না শুনিতে পাওয়া যায়। মনে হয় ছেলেটা আগেভাগে আসিয়া পড়িলেও গলায় রীতিমত জোর করিয়া আসিয়াছে।

দুই

কয়েকদিন পরের কথা।

রথ উপলক্ষ্যে কেতুপুরে কোনরকম ধুমধাম হয় না। পদ্মার ওপারে আছে সোনাখালি গ্রাম, রথের উৎসব হয় সেখানে। সোনাখালির জমিদারের ছোট একটি রথ বাহির হয়। সোনাখালি হইতে মোহনপুর অবধি দশ মাইল লম্বা একটা উঁচু পথ আছে; বর্ষাকালে এই পথটিই এ অঞ্চলে জলের নীচে ডুবিয়া যায় না। পথটির নাম ছ-কোশের পথ। নামের মধ্যে পথটির এক ক্রোশ দৈর্ঘ্য কেমন করিয়া বাড়িয়া গিয়াছে। বলা যায় না। সোনাখালির জমিদারের এই পথ ধরিয়া আধমাইল খানেক গিয়া অন্নবাবার-মাঠের একপাশে পড়িয়া থাকে সাতদিন, তারপর উল্টা-রথের দিনে আবার রওয়ানা হয় জমিদারের বাড়ির দিকে। স্থানটির অন্নবাবার-মাঠ নাম হওয়ার একটু ইতিহাস আছে। অনেকদিন আগে এ অঞ্চলে একবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। সে সময় কোথা হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া এই মাঠে আস্তানা গাড়েন এবং একটি বিরাট অন্নসত্র খুলিয়া দেন। নিজের বলিতে সন্ন্যাসী আসিয়া এই মাঠে আস্তানা গাড়েন এবং একটি বিরাট অন্নসত্র খুলিয়া দেন। নিজের বলিতে সন্ন্যাসীর এক কানাকড়ি সম্বল ছিল না শোনা যায়, এমনি আশ্চর্য ছিল মানুষের উপর তাঁহার প্রভাব যে সামনে দাঁড়াইয়া চোখে চোখে চাহিয়া তিনি হুকুম দিতেন আর বড় বড় জমিদার-মহাজনেরা মণ মণ চাল ডাল পাঠাইয়া দিত এই মাঠে। শত শত ভদ্র গৃহস্থ নিজেরাই কোমর বাঁধিয়া তাহা রান্না করিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীদের বিতরণ করিত অন্ন। যেসব বড় বড় উনানে সেই বিরাট ক্ষুধা-যজ্ঞের আগুন জ্বলিত আজ তাহার একটু কালির দাগ পর্যন্ত কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

রথের দিনে এই মাঠে প্রকাণ্ড মেলা বসে, উল্টা-রথ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। পদ্মা আগে তফাতে ছিল, এখন এত কাছে আসিয়াছে যে, মেলার একটা প্রান্ত প্রায় নদীতীরেই আসিয়া ঠেকে। স্থলপথ জলপথে দল বাঁধিয়া আসিয়া মানুষ মেলায় ভিড় বাড়ায়। ভিড় বেশী হয় প্রথম এবং শেষ দিন, মাঝখানের কদিন মেলা একটু ঝিমাইয়া যায়। গ্রামবাসীর প্রয়োজনীয় ও শখের পণ্য সমস্ত মেলায় আমদানি হয়, এমন কি শহরের নারী-পণ্যের আবির্ভাবও ঘটিয়া থাকে। কাপড়ের দোকান, মনোহারী দোকান, মাটির খেলনার দোকান, খাবারের দোকান, দোকান যে কত রকমের বসে তার সংখ্যা নাই। গরু-ছাগল বিক্রয় হয়, কাঁঠাল ও আনারসে মেলার একটা দিক ছাইয়া যায়, বড় বড় নৌকায় মালদহ ও ত্রিহুতের আম আসে। লেমোনেডের নামে বোতল ভরা

স্যাকারিনের তাল নিস্তেজ জল বিক্রয়-হয় অজস্র। মেয়েরা সাধ মিটাইয়া শাঁখাও কাচের চুড়ি পরে, ছেলেদের কোমরে বাঁধিয়া দেয় নূতন ঘুনসি। কয়েকটি স্থানে গভর্ণমেন্ট হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত জুয়াখেলা চলে। মেলায় এটা একটা প্রধান অঙ্গ। সবচেয়ে বেশী ভিড় হয় বালাখেলার কাছে। চারকোণা বাঁশের বেড়ার চারিদিকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া চার-চার পয়সার চার-চার বঅলা কিনিয়া বেশীর ভাগ চাষাভূষারাই হরদম ছুঁড়িতে থাকে, রুদ্ধশ্বাসে চাহিয়া দেখে নিক্ষিপ্ত বালাটি লাল সালুতে সাজানো টাকা আধুলি সিকি ও দোয়ানিক আরণ্যে অন্ধের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্থির হইতেছে ফাঁকা জায়গায়। পুনরাবর্তীত ব্যর্থতায় তাহাদের কোনমতে যেন বিশ্বাস হইতে চায় না। কত কাছাকাছি সাজানো মুদ্রাগুলি, ফাঁকা জায়গাই যে কম! ওদের মধ্যে কে বুঝি বৌ-এর জন্য একখানা পাছাপাড় শাড়ি, ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু খেলনা, ও খাবার এবং সংসারের জন্য একখানা পাছাপাড় শাড়ি, ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু খেলনা ও খাবার এবং সংসারের জন্য কী কী সব জিনিস কিনিতে অনেকদিনের চেষ্টায় জমানো কটা টাকা আনিয়াছিল, দেখে, সন্ধ্যার সময় দূরের মানুষ যখন বাড়ির দিকে শ্রান্ত পা বাড়াইয়াছে বেচারীর কাছে বিড়ি কিনিবার পয়সাও নাই! আজীবন উপার্জন করিযা সে পরকে খাওয়াইছে, সে যে কী নিরীহ গৃহস্থ! কারো কথা না ভাবিয়া আজ সে এ কী করিয়া বসিল। একবেলা স্বাধীনভাবে স্বার্থপরতা করিবার সুযোগ পাইয়া নিজেকে সামলাইতে পারিল না?

রথের দিন সকাল হইতে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি নামিয়াছিল। বেলা বাড়িলে নিদ্রাতুর চোখ মিটমিট করিতে করিতে গণেশ কুবেরের বাড়ি আসিল।

কুবের তখনও ঘুমাইতেছিল। গণেশ তাহাকে ডাকিয়া তুলিল। বলিল, চল, কুবির, না-টা ঠিক কইরা থুইয়া আহি। আমারে ডাইকা আজান খুড়া নায় গিয়া বইয়া আছে।

কুবের প্রকাণ্ড একটা হাই তুলিয়া বলিল, বয় গণেশা, বয়। অ পিসী, আমারে আর গণশারে দুগা মুড়ি দিবা গো? আ লো গোপী, আমারে নি একঘটি জল দিবার পারস?

ঘরে মুড়ি ছিল না। কদাচিৎ থাকে। পিসী চারটি চিড়া আর একটু গুড় দিয়া গেল। গুড় মুখে দিয়া শুকনো চিড়া চিবাইতে চিবাইতে কুবের বলিল, খা গণশা। রথের বাদলা নামছে দেখছস?

হ।

চালায় ছন চাপান লাগে। রাইতের বাদলায় ঘরে জল পড়ছিল, দেখ।

গণেশ চাহিয়া দেখিল, জল পড়িয়া ঘরের একটা কোণ সত্য ভাসিয়া গিয়াছে। জিহ্বায় সে একটা আফসোসের শব্দ করিল। বলিল, কোণ দিয়া পড়ছে তাই বাঁচান, না তো জিনিসপত্তর সকল ভাইসা যাইত। চালায় চাপাইবি নাকি ছন আইজ? মেলায় গেলি তো সময় পাবি না?

কুবের মাথা নাড়িয়া বলিল, ছন কই? নাই তো।

ছিল যে ছন?

গোপার মার বিছানায় পাইতা দিছি। ব্যাপারটা বুঝিয়া গণেশ গম্ভীর মুখে সায় দিয়া বলিল, ভালা করছস। যা বাদলা!

ধীরে ধীরে তাহারা চিড়া চিবাইতে লাগিল। গণেশ যে তাগিদ লইয়া আসিয়াছিল সে যেন তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। খাওয়া বন্ধ করিল আগে। বাড়ি হইতে সে দুটি পান্তা খাইয়া আসিয়াছে, কুবের খাক। ঘটিটা উঁচু করিয়া মুখে ঢালিয়া সে জল খাইল। আরও দুটি চিড়া মুখে দিয়া ব্যকিগুলি কুবের দান করিয়া দিল তাহার বড় ছেলেকে। বলিয়া না দিলে চিড়াগুলি সে একাই খাইতে পারে সন্দেহ করিয়া বলিল, চণ্ডীরে দুগা দিস লখ্যা, আঁই?

লখ্যা মাথা নাড়িয়া বলিল, উঁহুঁক। উয়ারে পিসী দিব।

পিসি আর নাই। দে কইলাম লখ্যা।

কুবেরের দুই ছেলেই উলঙ্গ। বর্ষার ভাপসা গুমোটে ঘামিয়া তাহাদের শীর্ণ দেহ চকচক করিতেছে। পিতৃদত্ত প্রসাদের ভাগ বাঁটোয়ারা লইয়া ঘরের কোণে দুজনের একটা ছোটখাট

কলহ বাধিয়া গেল। কুবের আর চাহিয়াও দেখিল না। এ যে তাহার ঠিক উদাসীনতা তা বলা যায় না। মনে মনে তাহার একটা অস্পষ্ট উদ্দেশ্যেই বুঝি আছে। শিক্ষা হোক। নিজের নিজের ভাগ বুঝিয়া লইতে শিখুক। দুদিন পরে জীবন-যুদ্ধে সমস্ত জগতের সঙ্গে যখন তাহাদের লড়াই বাধিবে তখন মধ্যস্থতা করিতে আসিবে কে?

ঘটিটা তুলিয়া লইয়া ঘরের সামনে সঙ্কীর্ণ দাওয়ায় উবু হইয়া কুবের উঠানে কুলকুচা করিল। গণেশের মত ঘটি উঁচু করিয়া আলগোছে জল খাইয়া কলিকায় তামাক সাজিতে বসিল। পিসী দাওয়ার এক পাশে ইলিশ মাছের তেলে ইলিশ মাছ ভাজিতেছে। অন্য পাশে মালার আঁতুড়। নীচু দাওয়ার মাটি জল শুষিয়া শুষিয়া ওখানটা বাসে অযোগ্য করিয়া দিয়েছে, তবু ওখানেই ভিজা স্যাঁতসেঁতে বিছানায় নবজাত শিশুকে লইয়া মলা দিবারাত্রি যাপন করিবে। উপায় কি? যে নোংরা মানুষের জন্ম লাভের প্রক্রিয়! বাড়িতে ঘর থাকিলেও বরং একটা ঘর অপবিত্র করিয়া ফেলা চলিত। দুখানা কুঁড়ে যার সম্বল তার স্ত্রী আর কোথায় সন্তানকে জন্ম দিবে? ভদ্রলোকেরা উঠানে অস্থায়ী টিনের ঘর তুলিয়া দেয়, চৌকির ব্যবস্থা করে। যারা আরও বেশী ভদ্রলোকে তাদের থাকে শুকনো খটখটে স্থায়ী আঁতুড় ঘর। কুবেরের তো সে ক্ষমতা নাই। তার যতখানি সাধ্য সে তা করিয়াছে। ভাল করিয়া বেড়া দিয়া বৃষ্টির ছাঁট আটকাইয়াছে, ঘর ছাইবার শণগুলি বিছানার তলে পাতিয়া দিয়াছে, দেবীগঞ্জের রেলকোম্পানীর কয়লা চুরি করিয়া আগুনের ব্যবস্থা করিয়াছে। আর সে কী করিতে পারে।

হঠাৎ এক মিনিটেরও কম সময় ঝুপঝুপ করিয়া জোরে বৃষ্টি হইয়া গেল। তারপর যেমন গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল তেমনি পড়িতে লাগিল। গণেশ দরজার কাছে সরিয়া আসিয়া বসিল, যাবি না কুবির,

কুবের বলিল, হ, ল যাই। আইচ্ছা তুই ক দেখি গণেশ, হীরুজ্যাঠার ঠাই দুগা ছন চামু নাকি? দিব না?

গণেশ বলিল—হীরুজ্যাঠা ছন দিব? জ্যাঠার তুই চিনস না কুবির, কাইলের কাণ্ড জানস? বিহানে ঘরে ফিরা শুমু, বউ কয় চাল বাড়ন্ত! খাও আইঠা কলা, ভর রাইত জাইগা ঘুমের লইগা দুই চক্ষু আঁধার দ্যাহেবৌরে কইলাম, হীরুজ্যাঠার ঠাঁই দুগা কর্জ আনগা। দুপুরে গাঁয়ে গিয়া কিনা আনুম। কলি না পিত্যয় যাবি কুবির, বৌরে জ্যাঠা ফিরাইয়া দিল। কয় কি, বিষ্যুদবার কর্জ দেওন মানা।

কুবের সবিস্ময়ে বলিল, হ? তর নিজের জ্যাঠা না!

নিজের জ্যাঠা বইলাই পিরীত য্যান বেশী কুবির। খালি নিবার পারে, দিবার পারে না।

এই কথাগুলি বলিতে পারার মধ্যে গণেশের পক্ষে বিস্ময়কর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আছে। কুবের শিরশ্চালনায় সায় দিয়া বলিল, আমার ঘরে পাঠালি না ক্যান বৌরে?

গণেশ যেমন বোকা, তেমনি সরল। সে বলিল, তুই চাল পাবি কনে?

এ কথায় অপমান বোধ করিয়া কুবের উঠিল রাগিয়া।

চাল পামু কনে! ক্যান আমরা ভাত খাই না! গরিব বইলা চাল কর্জ না দেওনের মত গরিম আমি না, জাইনা থুইস!

কুবের রাগে ও গণেশ লজ্জায় খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। শেষে গণেশ আস্তে আস্তে বলিল, গোসা করলা নি কুবিরদা?

মাঝে মাঝে, কুবেরের রাগের সময়, ভীরু গণেশ তাহাকে সম্মান করিয়া তুমি সম্বোধন করে।

করুম না! গাও জ্বালাইনা কথা কস যে! আজান খুড়া বইয়া আছে, ল যাই।

কুবের উঠানে নামিয়া গেল। বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়া উঠানটা কাদা ও পিছল হইয়া আছে। গৃহাঙ্গনের এই নোংরা পচা পাঁকের চেয়ে নদী তীরে কাদা অনেক ভাল। সেই কাদায় হাঁটু পর্যন্ত ডুবিয়া গেলেও যেন এ রকম অস্বস্তি বোধ হয় না। বাড়ির পাঁকে পায়ে হাজা হয়,

পাক ঘাঁটিয়া যাহার জীবিকা অর্জন করিতে, সে পাঁকের সংস্পর্শেই তাহারও পা কুটকুট করে। আকস্মিক ক্রোধে কুবের ছেলেমানুষের মত উঠানে একটা লাথি মারিল। পায়েল পাতার একটা পরিষ্কার ক্রোধে ছাপ মাত্র উঠানে পড়িল, আর কিছু হইল না।

আতুড় হইতে ক্ষীণস্বরে মালা বলিল, আ গো যাইও না, শুইনা যাও। চালা দিয়া নি ঘরে জল পড়ছে? ছনগুলা লইয়া যাও, বিছানার তলে ছন দেওন না দেওন সমান।

মালার মুখে এমন নিঃস্বার্থ উক্তি প্রায় শোনা যায় না। কুবেরের মুগ্ধ হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু তার পরিবর্তে সে বিরক্ত হইয়া বলিল, কিসের সমান! ছন না পাইতা ভিজা ভিতে শোওন যায়? রঙ্গ কইরা কাম নাই, চুপ মাইরা শুইয়া থাক। চালার লাইগা ছন লাগে, আইনা লমু।

হোসেন মিয়া কইছিল খড় দিব?

হোসেন মিয়া কইলকাতা গেছে।

মালা আফসোস করিয়া বলিল, কবে গেল? আগে নি একবার কইলা! এক পয়হার সুই আইনবার কইতাম—কইলকাতায় পয়হায় দশখান পাওন যায়।

কলিকাতা হইতে মালা এক পয়সার ছুঁচ আনিতে দিত শুনিয়া কেউ হাসিল না। পিসী বরং মালার কথায় সায় দিয়াই কী যেন বলিল, ঠিক বোঝা গেল না। জবাব দিবার প্রয়োজন ছিল না। কুবেরের পায়ের আঙুলের ফাঁকে হাজার ঘায়ে বিষাক্ত পাঁক কামড়াইতেছিল। সে নীরবে বাহির হইয়া গেল।

নদীতীরে নৌকায় তাহাদের কাজ ছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর নৌকা লইয়া তাহারা সোনাখালির মেলায় যাইবে। সঙ্গে ছেলেমেয়েরা থাকবে, কেতুপুর ও আশেপাশের গ্রাম হইতে এমন যাত্রীও পাওয়ার সম্ভাবনা আছে আছে যাহারা ভাড়া দিয়া মেলায় যাইবে। নৌকাটা একটু সাফ করিয়া একটা অস্থায়ী হোগলার ছই খাটাইয়া দেওয়ায় দরকার। নৌকার ছোট পালটি মেরামত করিবার জন্য নামানো হইয়াছিল, বাঁশের মাস্তুলে সেটিও আবার ঠিক করিয়া খাটাইতে হইবে। বর্ষাকালে বাতাসে প্রায় সোনাখালির দিকেই বহিতে থাকে, গুমোট করিয়া সামান্য বাতাস যদি উঠে, পাল তুলিয়া মেলায় পৌছিতে আজ একঘণ্টা সময়ও লাগিবে না।

নদীর ধারে পৌছিয়াই তাহারা দেখিতে পাইল ছাতি মাথায় দিয়া হোসেন মিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঘর ছাইবার জন্য হোসেনর কাছে বিনামূল্যে কিছু শণ পাইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহাকে দেখিয়া কুবেরের খুশী হওয়াই উচিত ছিল। তবু লোকটার আবির্ভাবে চিরদিন সে দুর্জ্ঞেয় আশঙ্কা তাহাকে অস্বস্তি বোধ করায় আজও সেই আশঙ্কাই হঠাৎ তাহাকে দাঁড় করাইয়া দিল। চুপিচুপি বলিল, হোসেন মিয়ারে গণেশ!

তাই তো দেহি!

একটু রহস্যময় লোক এই হোসেন মিয়া। বাড়ি তাহার নোয়াখালি অঞ্চলে। কয়েক বৎসর হইতে কেতুপুরে বাস করিতেছে। বয়স তাহার কত হইয়াছে চেহারা দেখিয়া অনুমান করা যায় না, পাকা চুলে সে কলপ দেয়, নুরে মেহেদি রঙ লাগায়, কানে আতরমাখানো তুলা গুঁজিয়া রাখে। প্রথম যখন সে কেতুপুরে আসিয়াছিল পরনে ছিল একটা ছেঁড়া লুঙ্গি, মাথায় একঝাঁক একঝাঁক রুক্ষ চুল-ঘষা দিলে গায়ে খড়ি উঠিত। জেলেপাড়া-নিবাসী মুসলমান মাঝি জহরের বাড়িতে সে আশ্রয় লইয়াছিল, জহরের নৌকায় পৈঠা বাহিত। আজ সে তাহার বেঁটে-খাটো তৈল-চিক্কণ শরীরটি আজানুলম্বিত পাতলা পাঞ্জাবিতে ঢাকিয়া রাখে, নিজের পানসিতে পদ্মায় পাড়ি দেয়। জমি-জায়গা কিনিয়া, ঘরবাড়ি তুলিয়া পরম সুখেই সে দিন কাটাইতেছে। গত বছর নিকা করিয়া ঘরে আনিয়াছে দু নম্বর স্ত্রীকে। এইসব সুখের ব্যবস্থা সে যে কী উপায়ে করিয়াছে গ্রামের লোক ঠিক অনুমান করিয়া উঠিতে পারে না। নিত্য নূতন উপায়ে সে অর্থোপার্জন করে। নৌকা লইয়া হয় তো সে পদ্মায় মাছ ধরিতে গেল—গেল সে সত্যই, কারণ যাওয়াটি সকলেই দেখিতে পাইল, কিন্তু পদ্মার কোনখানে সে মাছ ধরিল, মাছ বিক্রিই বা করিল কোন বন্দরে, কারো তাহা চোখে পড়িল না। তাহার নৌকার মাঝিদের জিজ্ঞাসা করিয়া

একটা গল্পমাত্র শোনা গেল যে, যে বন্দরে তাহারা মাছ বিক্রয় করিয়াছে সেখানে নৌকায় যাতায়াত করিতে নাকি সাত-আটদিন সময় লাগে। তারপর কয়েকদিন হয়তো হোসেন গ্রামেই বসিয়া থাকে, একেবারে কিছুই করে না। আবির্ভাব তাহার ঘটে হঠাৎ এবং কিছুদিন পরে দু-শো গোরু-ছাগল চালান হইয়া যায় কলিকাতায়।

বড় অমায়িক ব্যবহার হোসেনের। লালচে। রঙের দাড়ির ফাঁকে সব সময়েই সে মিষ্টি করিয়া হাসে। যে শত্রু, যে তাহার ক্ষতি করে, শাস্তি সে তাহাকে নির্মমভাবেই দেয়, কিন্তু তাহাকে কেহ কোনদিন রাগ করিতে দেখিয়াছে বলিয়া স্মরণ করিতে পারে না। ধনী-দরিদ্র, ভদ্র-অভদ্রের পাথৃক্য তার কাছে নাই, সকলের সঙ্গে তার সমান মৃদু ও মিঠা কথা। মাঝে মাঝে এখনো সে জেলেপাড়ায় যাতযাত করে, ভাঙা কুটীরের দাওয়ায় ছেঁড়া চাটাই-এ বসিয়া দা-কাটা কড়া তামাক টানে। সকলে চারিদিকে ঘিরিয়া বসিলে তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। এইসব অর্ধ-উলঙ্গ নোংরা মানুষগুলির জন্য বুকে যেন তাহার ভালবাসা আছে। উপরে উঠিয়া গিয়াও ইহাদের আকর্ষণে নিজেকে সে-যেন টানিয়া নীচে নামাইয়া আনে। না, মনে মনে ইহা বিশ্বাস করে না জেলেপাড়ার কেহই। জীবন-যুদ্ধে ঋয়-পরাজয়ের একেবারে মিলনসীমান্তে তাহরা বাস করে, মিত্র তাহাদের কেহ নাই। তবে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের জন্য কিছু আসিয়া যায় না। হোসেন মিয়া হাসিমুখে একেবারে বাড়ির ভিতরে গিয়া জাঁকিয়া বসিয়া গোপনে তাহার গভীর ও দুর্জ্ঞেয় মতলব হাসিলের আয়োজন আরম্ভ করিলেও জেলেপাড়ায় এমন কেহ নাই যে, তাহাকে কিছু বলিতে পারে। বলিতে হয়তো পারে। বলে না শুধু এই জন্যে যে বলা নিরর্থক। তাতে কোন লাভ হয় না। যা সে ঘটায় সমস্তই স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী। অন্যথা করিবার জন্য বুক ঠুকিয়া দাঁড়াইরে কার কী লাভ হইবে? তার চেয়ে বর্ষাকালে ঘরের ফুটা চাল যদি একটু মেরামত হয়, উপবাসের সময় বিনা সুদে যদি কিছু কর্জ মেলে, তাই ঢের লাভ।

হোসেন মিয়ার গোপন মতলবের দুটো একটার খবর যে জেলেপাড়ার লোকেরা রাখে না তা নয়। জেলেপাড়ার তিনটি পরিবার উধাও হইয়া গিয়াছে। হোসেন মিয়া যে ছেলে-বুড়ো স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে এক-একটি সমগ্র পরিবারকে কোথায় রাখিয়া আসিত প্রথমে কেহ তাহা টের পায় নাই, পরে জানা গিয়াছিল নোয়াখালির ওদিকে সমুদ্রের মধ্যে ছোট একটি দ্বীপে প্রজা বসাইয়া সে জমিদারী পত্তন করিতেছে। সে দ্বীপ নাকি গভীর জঙ্গলে আবৃত, শহর নাই, গ্রাম নাই, মানুষের বসতি নাই, শুধু আছে বন্য পশু এবং অসংখ্য পাখি।

কিছু কিছু জঙ্গল সাফ করিয়া এই দ্বীপে হোসেন মিয়া ঋণগ্রস্ত উপবাসখিন্ন পরিবারদের উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে। লোভ দেখইয়া, আশা দিয়া, এক-একটি নিরুপায় পরিবাকে সে এই দ্বীপে লইয়া যায়, সৃষ্টির দিন হইতে কখনো আবাদ হয় নাই এমন খানিকটা জমি দেয়, খাকিবার জন্য ঘর দেয়, আবাদের জন্য দেয় হাল-বলদ ও জঙ্গল কাটিবার জন্য যন্ত্রপাতি। অন্যান্য স্থান হইতে আর কতগুলি পরিবারকে সে ওানে লইয়া গিয়াছে কে জানে, কিন্তু কেতুপুরের জেলেপাড়ার তিনঘর মাঝিকে সে যে আদিম অসভ্য যুগের চাষায় পরিণত করিয়াছে এ খবর জেলেপাড়ার কারো অজানা নাই। তবু, জানা না-জানা তাহাদের পক্ষে সমান। মাথা নীচু করিয়া তাহারা হোসেন মিয়ার দেওয়া উপকার গ্রহণ করিবে। মনুষ্য-বাসের অযোগ্য সেই দ্বীপকে জনপদে পরিণত আহ্বান আসিলে যতদিন পারে মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিবে, যেদিন পারিবে না সেদিন স্ত্রীপুত্রের হাত ধরিয়অ নিঃশব্দে হোসেন মিয়ার নৌকায় গিয়া উঠিবে।

তাই মনে মনে লোকটাকে ভয় করিলেও কাছে গিয়া কুবের বলিল, ছালাম মিয়া বাই।

হোসেন বলিল, ছালাম। কেমন ছিলা মাঝি? কাহিল মালুম হয়?

জ্বরে ভুগলাম। কইলকাতার থনে আইলেন কবে?

আইজ আইলাম। আর গণেশ বাই, খবর কী? মেলায় যাবা না?

গণেশ ঢোক গিলিয়া বলিল, যামু মিয়া বাই, মেলায় যামু! পোলা-পানেরা মেলায় যাওনের লেইগা খেইপা আছে, না গেলে চলব ক্যান?

গুমটি দিছে, বাদাম চলব না। সকাল সকাল রওনা দিবা। বদর কইও মাঝি, সাঁঝের আগে ফিরয়া আইও, আসমান ভাল দেখি না। শুইনা আলাম আজকালির মদ্যি জবর ঝর হইবার পারে।

কুবের আকাশের দিকে ও নদীর দিকে চাহিল। পাতলা কুয়াশার মত মেঘ আকাশ ভরিয়া আছে, নিস্তরঙ্গ পদ্মার বুকে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিপাতের অসংখ্য ছোট ছোট বুদবুদ উঠিয়া ফাটিয়া গেলে যেমন দেখায় তেমনি দেখাইতেছে। নদীর অপর তীর চোখে পড়ে না, মাঝখানের নৌকা পর্যন্ত অস্পষ্ট। আরও এদিকে একটি স্পষ্টতর নৌকার দিকে চোখ রাখিয়া কুবের সংক্ষেপে প্রশ্ন করিল, যামুনা মেলায়? বারণ করেন নাকি মিয়া বাই?

হোসেন বলিল, যাবা না ক্যান? ডর কিসের? আসমান দেইখা রওনা দিবা, আসমান দেইখা ফিরবা। বাদলা দিনের ঝড় জানান দিয়া আহে!

সায় দিয়া কুবের নৌকায় উঠিল। মুসলমান মাঝির দুটি নৌকা ইতিমধ্যেই মেলায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, দুটি নৌকাটি একসঙ্গে ছাড়িয়া গেল। নদীর জল তুলিয়া নৌকা ধুইতে ধুইতে এক সময় চাহিয়া দেখিল, হোসেন চলিয়া গিয়াছে। চালার জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় শণের কথাটা এতক্ষণে তাহার মনে পড়িয়াছে, হোসেনকে বলিয়া রাখিলে ভাল হইত। লোকটা এই আছে, এই নাই। শণের জন্য কাল সকালে হয়তো ওর বাড়ি গিয়া শুনিবে, রাতারাতি ও ঢাকায় পাড়ি দিয়াছে। কবে ফিরিবে? কে তাহা জানে।

হোগলার ছাউনিটা বাতার সঙ্গে বাঁধিতে বাঁধিতে কুবের হঠাৎ সচকিত হইয়া বলিল, কে হাঁকে রে গণেশ?

বহুদূর নদীবক্ষ হইতে হাঁক আসিতেছিল, মানব-কণ্ঠের একটানা একটা ক্ষীণ আওয়াজ। দুই কানের পিছনে হাত দিয়া হাঁক শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কুবের সাড়া দিয়া উঠিল। এ এক ধরনের ভাষা পূর্ববঙ্গের মাঝির লোক ছাড়া এ ভাষা কেহ জানে না। এ ভাষায় কথা নাই, আছে শুধু তরঙ্গায়িত শব্দ। উন্মুক্ত প্রান্তরে বিস্তৃত নদীবক্ষে এ শব্দ দূর হইতে দূরে চলিয়া যায়, ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসে, কিন্তু তরঙ্গের তারতম্য অবিকল থাকিয়া যায়। অস্ফুট গুঞ্জনের মত মৃদু হইয়াও যদি কানে আসিয়া লাগে, পদ্মা-নদীর মাঝি কান পাতিয়া শুনিয়া অর্থ বুঝিতে পারে। শব্দের দুর্লক্ষ্য উৎসের দিকে চাহিয়া বুক ভরিয়া বাতাস গ্রহণ করে। বাঁ হাত কানের পিছনে রাখিয়া ডান হাতটি মুখের সম্মুখে আনিয়া সঞ্চালিত করিয়া উচ্চারিত একটানা আওয়াজে সে তরঙ্গের সৃষ্টি করে।

ধনঞ্জন মন দিয়া শোনে নাই। সে জিজ্ঞাসা করিল, কেডা? কী কয়?

কুবের কহিল, আমাগেরা রাসু।

ধনঞ্জয় অবাক হইয়া গেল।

বিন্দা মাঝির পোলা? কস কী কুবির! শুনছস নি ঠিক?

রাসুর গলা চিনি না খুড়া? অখনি আইব, দেইখো।

ধনঞ্জয়ের বিস্ময় কমিতে চায় না। বহুদূরের নৌকাটির দিকে চাহিয়া সে বলিল, রাসু না হোসেন মিয়ার দ্বীপে গেছিল?

হ।

আইল কিবা?

কুবের বিরক্ত হইয়া কহিল, কিবা কমু খুড়া? আহুক, জিগাইও। হোসেন মিয়া ছাইড়া দিবার পারে, ও নিজে পালাইয়া আইবার পারে, না জিগাইয়া নি কওয়ন যায়?

খানিক পরে আবার হাঁক আসিল, এবার আরও স্পষ্ট। হাঁকের আওয়াজে যে একটি উৎসুক সুর ছিল তিন জনের কিছুই জানের কানেই তাহা ধরা পড়িল। গণেশ কুবেরের মুখের দিকে চাহিয়া কী বলিতে গিয়া হাঁ করিয়া কিছুই বলিল না। হাঁকের জবাব দিবার জন্য কুবের সুদীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করিল।

কিছুক্ষণ পরে একটা জীর্ণ পুরাতন নৌকা আসিয়া ভিড়িল পাশে। দুজন অচেনা মাঝি নৌকা বাহিয়া আসিয়াছে। ভিন্ গাঁয়ের নৌকা। নৌকার খোলটা কাঁঠালে এমন ভাবে বোঝাই করা হইয়াছে যে, নৌকার প্রান্তভাগ জলের উপর কয়েক ইঞ্চিমাত্র ভাসিয়া আছে। উপরের কোনরকম আবরণ নাই, গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিতে মাঝি দুজন এবং রাসু তিনজনেই ভিজিয়া গিয়াছে। তাড়া দিয়া রাসুকে এ নৌকায় নামাইয়া দিয়া মাঝি দুজন বোধহয় বিড়বিড় করিয়া তাহাকে গাল দিতে দিতেই তৎক্ষণাৎ আবার ঠেলা দিয়া নৌকার মুখ ফিরাইয়া বৈঠা ধরিল। পদ্মানদীর চিরন্তন রীতি অনুসারে কুবের জিজ্ঞাসা করিল কোন গাঁও থেইকা আইলা মাঝি, যাইবা কোয়ানে?

জবাব দিবার রীতিও চিরন্তন। তাহার সক্রোধে বলিল, সুলপী থেইকা আইলাম, যামু মেলায়।

রাগের কারণটা তাহাদের সহজেই বোঝা যায়। সুলপী হইতে সোজাসুজি সোনাখালির মেলায় যাওয়ার বদলে রাসুকে এখানে পৌঁছাইয়া দিতে তাহাদের পদ্মা পার হইতে হইয়াছিল। প্রতিদানে রাসু যে তাদের কিছুই দিতে পারে নাই তাহাও অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কিন্তু এ ক্রোধ তাহাদের ফলপ্রসূ নয়—এ শুধু ক্রোধ। রাসুর মত দুরবস্থায় পড়িয়া আবা যখন কেহ পদ্মা পার করিয়া দিবার অনুরোধ জানাইবে এমনিভাবে রাগিয়া উঠিলেও সেই নিরুপায় মানুষটিকে তাহারা না বলিতে না, বিনা প্রত্যাশায় বোঝাই নৌকা লইয়া তিন ক্রোশ অতিরিক্ত বৈঠা বাহিবে। ইহা মহত্ব নয়, পরোপকার নয়—ইহা রীতি; অপরিহার্য নিয়ম। আশ্চর্য এই, নিয়ম পালন করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠাও অনিয়ম নয়।

নৌকায় পা দিয়া রাসু খানিকক্ষণ আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর কুবেরকে জড়াইয়া ধরিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিল, আমি আলাম গো কুবিরদা।

কন থে আলি রাসু?

কই কুবিরদা, কই। তোমাগো দেইখা মুখে রাও সরে না, কতকাল পরে ফিরে আলাম।

কুবের ও গণেশ তাহার চোখে জল দেখিতে পাইল। ধনঞ্জয় পড়িয়াছিল তাহার পিছনে। সে উপস্থিত থাকিতে রাসু যে আসিয়া পৌঁছিয়াই কুবেরকে জড়াইয়া ধরিয়া আহ্লাদে ডগমগ হইয়া উঠিল ইহাতে মনে মনে সে ঈর্ষাতুর ও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। রাসুর আবির্ভাবে উত্তেজনা তাহারও কম হয় নাই। তাহা গোপন করিয়া শান্ত উদাসভাবে সে বলিল, বয় রে রাসু, বয়।

কুবেরকে ছাড়িয়া রাসু হোগলার নীচে নৌকার আধভেজা পাটাতনের উপর বসিয়া পড়িল। হাতের উল্টা পিঠে চোখ মুছিয়া পরনের জীর্ণ বসনে ঘষিয়া হাতে-লাগা অশ্রু মুছিয়া ফেলিল। তিন জোড়া চোখ চাহিয়া রহিল তাহার শীর্ণ কঙ্কালসার দেহটির দিকে। তিন বছর আগে হোসেন মিয়ার সঙ্গে সপরিবারে সে যখন ময়নাদ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিল, দেহ তখন তাহার অবশ্য বিশেষ পরিপুষ্ট ছিল না, কিন্তু এমনভাবে ভাঙিয়াও সে পড়ে নাই। রাসুর মাথার বড় বড় চুল জট বাঁধিয়া গিয়াছে, সর্বাঙ্গে অনেকগুলি ক্ষতের চিহ্ন, কয়েকটা ঘা এখনও ভাল করিয়া শুকায় নাই। দুটি পাই তাহার হাঁটুর কাছ হইতে গোড়ালি পর্যন্ত ফোলা। গায়ের চামড়া যেন তাহার আলগা হইয়া শুকাইয়া শক্ত ও কালো হইয়া উঠিয়াছিল, এখন বৃষ্টির জলে ভিজিয়া ভিজা জুতার চামড়ার মত স্যাঁতসেঁতে দেখাইতেছে। একটু আগে বহুদূর হইতে অত জোরে হাঁক দিবার শক্তি সে কোথায় পাইয়াছিল ভাবিয়া কুবের অবাক হইয়া রহিল।

রাসু ঝিমাইয়া পড়িতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল, ময়নাদ্বীপ থেইকা আলি না রাসু?

হ।

পলাইয়া আইছস?

হ, বৈশাখ মাসে।

বৈশাখ মাসে? এতকাল কই ছিলি তুই?

নোয়াখালি ছিলাম। বিস্যুদবারে আইলাম সুলপী। কমুনে আজান খুড়া, সগগল কমু। এখনে ক্ষুধায় মরি-অ কুবিরদা, কিছু নি দিবার পর?

তখনকার মত কৌতূহল নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া রাসুকে সঙ্গে করিয়া তিনজনে গ্রামে ফিরিয়া গেল। ধনঞ্জয়ের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছিবার আগেই রাসুর আবির্ভাবের বার্তা রাষ্ট্র হইয়া গের জেলেপাড়ার সর্বত্র। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধনঞ্জয়ের উঠান জেলেপাড়ার কৌতূহলী ছেলে-মেয়ে-স্ত্রী-পুরুষে ভরিয়া উঠিল। সকলের চোখে অপার বিস্ময়। তিন বছর আগে সকলে যাহাকে মৃত্যুমুখে সঁপিয়া দিয়াছিল, তিন বছর যাহাকে সকলে একরকম ভুলিয়াই ছিল, হঠাৎ সে আবার ফিরিয়া আসিল কোথা হইতে? রাসুর মামা আশি বছরের বুড়া পীতম মাঝিও ন্যুব্জ দেহ লইয়া লাঠিতে ভর দিয়া আসিয়া পড়িল। রাসু দাওয়ার উপরে চাটাইয়ে বসিয়া মুহ্যমানের মত একটা পরিচিত এই জনতার দিকে স্তিমিত নিস্তেজ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছিল, কাছে গিয়া ক্ষীণদৃষ্টি পীতম মাঝি তাহাকে অনেকক্ষণ ঠাহর করিয়া দেখিল। চিনিতে পারিয়া ভাবাবেগে হাত হইতে লাঠিটা খসিয়া যাওয়ায় হঠাৎ ভাগ্নের গায়ের উপরেই হুমড়ি খাইয়া সে উঠিল কাঁদিয়া। হুমড়ি খাইয়া পড়িবার আঘাতে নয়, কাঁদিয়া উঠিল সে এই বলিয়া সে রাসু একা ফিরিয়া আসিল, আর সকলে কই?

সে আহারের পীড়নে রাসু একদিন সপরিবারে ঘরছাড়া হইছিল, দুমুঠা চাল দিয়া পীতম তাহা লাঘব করিবার কোন চেষ্টাই করে নাই। তাই বলিয়া তার এই কান্না যে অশোভন হইল তা নয়। সেই দুর্দিনে মামার স্বাভাবিক উদাসীনতার স্মৃতি রাসুও মনের মধ্যে পুষিয়া রাখে নাই। শুধু সেই দুর্দিনের স্মৃতি নয়, সবই যেন সে এতক্ষণ ভুলিয়াছিল, তাহার দুঃখ-বেদনার সর্বাঙ্গীণ ইতিহাস। পীতমের কান্না শুনিয়া সেও হঠাৎ ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল : আমি একা ফিরা আইলাম গো মামা, সবকটারে গাঙের জলে ভাসাইয়া দিয়া আমি একা ফিরা আইলাম।

কান্নার মধ্যেও পীতম চমকাইয়া উঠিল। একেবারে বেখাপ্পা সুরে প্রশ্ন করিল, কস কী রাসু, সব কটা গেছে?

রাসু সায় দিয়া বলিল, সব গেছে মামা, আমার কেউ নাই।

কেউ নাই। এক স্ত্রী, দুই পুত্র ও এক কন্যা, একুনে এই চারজনকে সঙ্গে লইয়া সে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছিল, হোসেন মিয়ার জঙ্গলাকীর্ণ ময়নাদ্বীপের উপনিবেশ একে একে চারজনেই মৃত্যুর দেশে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে। এই গভীর শোকাবহ সংবাদে কেতুপুরের জেলেপাড়া নিবাসী নরনারী মূক হইয়া গেল। অথচ এই সংবাদ রাসুর আকস্মিক আবির্ভাবের মতও বিস্ময়কর নয়। সকলেই ইহা জানিত। সমুদ্রের মধ্যে যে দ্বীপ সৃষ্টির দিন হইতে মানুষ বাস করে নাই সেখানে গিয়া কাহারো বাঁচিবার উপায় আছে? রাসুরা যখন সেখানে যায় তখন সকলে নিশ্চিত জানিয়াছিল তাহারা মরিতে যাইতেছে। রাসু যে জীবিতাবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে আশ্চর্য তো এইটুকুই! এমনি আশ্চর্য যে রাসুকে সম্মুখে দেখিয়াও যেন বিশ্বাস হইতে চাহে না যে সে সত্যই ফিরিয়া আসিয়াছে।

ধনঞ্জয়ের বৌ বুতির মা একটি কলাই-করা পাত্রে খানিকটা ঘোল আনিয়া দেয়, রাসু চোখের পলকে এক নিশ্বাসে তা গিলিয়া ফেলে। সমবেত জনতা এতক্ষণ বিশৃঙ্খল হইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে প্রত্যেকে এক-একটি সুবিধাজনক স্থান গ্রহণ করিয়া বসিয়া পড়িলে রাসুকে ঘিরিয়া একটি সুন্দর শৃঙ্খলাবদ্ধ সভার সৃষ্টি হয়। তারপর একে একে উঠিতে থাকে প্রশ্ন। জবাবে রাসুর প্রত্যেকটি কথা সকলে সাগ্রহে গিলিতে থাকে।

পীতম শিহরিয়া জিজ্ঞাসা করে, ময়নাদ্বীপে বাঘ-সিঙ্গি আছে না রাসু?

আছে না? আঘ-সিঙ্গিতে বোঝাই।

বলিয়া সকলের মৃদু শিহরণ লক্ষ্য করিয়া এই অর্ধমৃত অবস্থাতেও গর্বের উত্তেজনা রাসুকে যেন নবজীবন দান করে, ভাঙিয়া পড়িবার ভঙ্গিতে বসিয়া থাকার বদলে হঠাৎ সে হইয়া যায় সিধা। বলে, বাঘ-সিঙ্গি! নামে ডরাইলা? কী নাই ময়নাদ্বীপে কও? সাপ যা আছে এক-একটা,

আস্ত মাইনষের টাইনা নিয়া যায়—

হ, বলিতে বলিতে মুখ খুলিয়া যায় রাসুর আর শুনিতে শুনিতে হাঁ হইয়া যায় তাহার শ্রোতাদের মুখগুলি। হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপ, এমন ভীষণ স্থান সেটা?

যাহারা রথের মেলায় গিয়াছিল একে একে তাহারা ফিরি আসিতে থাকে। সন্ধ্যার সময় জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে আজিকার সন্ধ্যাটি সানন্দ। বৌরা হাসিমুখে লাল পাছাপাড় শাড়ি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখে, নূতন কাচের চুড়ির বাহারে মুগ্ধ হয়, কাচ ও কাঠের পুঁতির মালা সযত্নে কুলুঙ্গিতে তুলিয়া রাখে, ছেলেমেয়েরা বাঁশি বাজায় আর মাটির পুতুল বুকে জড়াইয়া ধরে। আহ্লাদ বহন করিয়া এই তুচ্ছ উপকরণও যে কুটিরে আসে না, সেখানে যে বিষাদ জমাট বাঁধিয়া থাকে তা নয়, কোন না কোন রূপে সোনাখালির মেলায় আনন্দের ঢেউ সে কুটিরেও পৌঁছিয়াছে। একটি কাঁঠাল, দুটি আনারস, আধসের বতাসা—এই দরিদ্রের উপনিবেশেও যে দরিদ্রতম পরিবার শুধু নুন, আর অদৃষ্টকে ফাঁকি দিয়া ধরা পুঁটির তেলেভাজা পুঁটিমাছ গিয়া দিনের পর দিন আধপেটা ভাত খাইয়া থাকে—খুশী হইয়া উঠিতে আর তাহাদের অধিক প্রয়োজন কিসের? কুবেরের প্রতিবেশী বুড়া সিধু দাস একটি পয়সা সম্বল করিয়া মেলায় গিয়াছিল, পয়সাটি সে খরচ করে নাই। কিন্তু মেলা হইতে সে যে বিপুল সম্পদ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে তাহাতে তাহার বৃহৎ পরিবারে আজ উৎসবের অন্ত নাই। ভিক্ষা সিধু করে নাই, বাগাইয়াছে। সারাদিন মেলায় ঘুরিয়া যেন-তেন-প্রকারেণ সংগ্রহ করিয়াছে। সংগ্রহ করিয়াছে তিনটি দাগধরা প্রকাণ্ড ফজলী আম, একটা তুলতুলে পকা আস্ত খাজা কাঁঠাল, সের তিনেক একত্র মেশানো চাল ডাল খুদ আর খাসির একটা মাথা। গরিবের উৎসবের আর কী চাই? কুড়ানো ফেলা জিনিস মাথাটা ধরিতে গেলে সে একরকম চুরিই করিয়াছে বলিতে হয়। কিন্তু তাতে কী? ভিক্ষা সিধু কারো কাছে চায় নাই, পয়সা সিধু

কুবেরের উঠানে দাঁড়াইয়া সিধু বলে, আমারে না নিয়া ফিরা৷ আলি কুবির?

দাওয়ায় ডিবরির আলোতে কুবের একটা কোঁচের লোহার শলাকাগুলি পরীক্ষা করিতেছিল, মুখ না তুলিয়াই বলে, তুমি না হীরু জ্যাঠার নায় আগেই ফিরা৷ আইল্যা?

সিধু দাওয়ায় উঠিয়া যায়।

তা আইলাম, কুবির, তা আইলাম। রঙ্গ কইরা কইলাম, বোঝস না? কোঁচটা কিনা৷ আনলি সন্দ করি। নিল কত?

আষ্ট আনা!

আট-দশ হাত লম্বা সরু তল্লা বাঁশের ডগায় দশ-বারোটি তীক্ষ্ণ লোহার শলাকা বসানো মাছমারা যন্ত্রটি সিধুও গম্ভীর মুখে পরীক্ষা করিয়া দেখে। গোড়ার দিকটা ধরিয়া অন্ধকার উঠানে ছুঁড়িবার অভিনয় করিয়া বলে, ভার মন্দ না, জিতছিস কুবির। কাল-পরশুতক আমিও একটা কিনা লমু।

সিধুর মতলব কুবের ঠিক বুঝিতে পারে না। কোঁচটি সে ঘরের মধ্যে কোণায় দাঁড় করাইয়া রাখিয়া আসে। বিকালে বৃষ্টি হইয়া গুমোট করিয়া আছে; আকাশে বিশেষ মেঘ নাই বটে কিন্তু কখন যে মেঘ ঘনাইয়া আসিয়া মুষলধারে বৃষ্টি নামিবে বলা যায় না। রাসুকে পীতম তাহার বাড়ি লইয়া গিয়াছে। এখন হয়তো আবার তাকে ঘিরিয়া সভা বসিয়াছে। সেখানে, নিজের নির্বাসনের কাহিনী বলিয়া রাসু সকলকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অত্যন্ত ক্ষুধা না পাইলে কুবেরও সেখানে গিয়া বসিত। পিসী হাঁড়িতে ভাত ফুটাইতেছে, না খাইয়া রাসুর রোমাঞ্চকর গল্পের লোভেও কোথাও যাওয়ার ক্ষমতা এখন তার নাই।

সিধু বসিয়া বসিয়া বাজে কথা বলে, শিথিল ছাড়া-ছাড়া তাহার ভাষা, অনির্দিষ্ট অবান্তর বিষয়বস্তু। কুবের আনমনে সায় দিয়া যায় ঃ হ!

পেটে ক্ষুধার জ্বালা, মনে পীতম মাঝির বাড়ি যাওয়ার তাগিদ, বুড়া সিধুর বকবক শুনিতে শুনিতে বিরক্তির তাহার সীমা থাকে না।

শেষে সিধু যেন প্রসঙ্গক্রমেই বলে, খাসির একটা মাথা আনলাম কুবির! মস্ত মাথাখান—মইয়ের মত দুটা সিং।

নিল কত?

শ্যাষ বেলা সস্তা কিনলাম কুবির। পুরা পাঁচ আনা চাইয়া শ্যাষ-ম্যাষ চৌদ্দ পয়হায় দিল। মাইয়াটারে ব্যানুন রাঁইধবারে কইলাম, তা কয়, তেলমরিচ নাই, চালও নাকি বাড়ন্তে

সিধুর কথা শুনিবার সমস্ত আগ্রহ কুবের সহসা হারাইয়া ফেলে। পিসীকে সে জিজ্ঞাসা করে, ভাত হইল পিসী? একেবারে সে পিছন ফিরিয়া বসে সিধুর দিকে।

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া সিদু উঠিয়া যায়। বাঁশের একটা টুকরিতে খাসির কোটা মাথাটা আনিয়া কুবেরের সামনে ধরিয়া বলে, দেখ কুবির, মিছা কই নাই। ঘাড়ের কাছে খাসাখানিক মাংস ছিল, এই দেখ—টুকরিরর কাছে মুখ লইয়া ঠাহর করিয়া সিধু কয়েক টুকরো মাংস বাছিয়া কুবিরকে দেখায়। করুণ নয়নে কুবেরের মুখের দিকে চাহিয়া বলে, ত্যাল-মরিচ দিয়া ব্যানুন যা হইবে—অমর্ত। আমিনুদ্দিন ঠাঁই প্যাঁজ-রসুন মাইগা আইনা—

আমাদের দেখাও ক্যান? রাঁধগা ব্যানুন।

সিধু এবার স্পষ্ট করিয়াই বলে, ত্যাল-মরিচ আর একমুঠা চাল দে কুবির। তরেও দিমুনে ব্যানুন।

কুবের সন্দিগ্ধ হইয়া বলে, দিবানি নিয্যস?

সিধু আহত হইয়া বলে, দিমু না? কস কী কুবির? তরে না দিয়া যামু কই?

তেল-মশলা এবং চাল লইয়া সিদু উঠিল! আঁতুড় হইতে মালা বলিল, বুড়া কী বজ্জাত?

মাথার ভাগ দিব না! আইঠা কলা দিব, দেইখো। কুবের উদাসভাবে বলিল, না দেয় না দিব। আজ তো শ্যাষ না, আরেকদিন আইলে মাইরা খেদাইয়া দিমু—আমার লগে চালাকি কইরা যাইব কই?

ভাত নামিলে ইলিশ মাছ ভাজা আর লঙ্কারক্তিম তরকারি দিয়া ফেনসমেত তপ্ত অন্নে কুবের মুহূর্তের মধ্যে পেট ভরাইয়া ফেলিল। গোপীকে খানিক পরে একটা বাটি লইয়া গিয়া সিধুর কাছ হইতে খঅসির মাথার ব্যঞ্জন আনিতে বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

পীতম মাঝির বাড়ি জেলেপাড়ার একেবারে উত্তর সীমান্তে। গোয়ালের ভিতর দিয়া তাহার বাড়িতে ঢুকিতে হয়; গোয়ালের একদিকে বাঁধা থাকে দুইটি শীর্ণ গরু, অন্যদিকে থাকে পীতমের প্রসিদ্ধ বেড়া-জাল, এতবড় জাল কেতুপুরের আর কাহারও নাই। বাড়িতে উঠানের বালাই নাই, গোয়াল পার হইয়া ঢুকিতে হয় প্রকাণ্ড একটা ঘরে। দু-পাশের ছোট দুখানা ঢুকিবার দরজাও এই ঘরের ভিতর দিয়া। কার্পণ্য ও বেড়াজালটির মত বাড়ি করার এই খাপছাড়া ঢংও পীতমের কম প্রসিদ্ধ নয়, লোকে নাম দিয়াছে কয়েকখানা। ঘরের পিছনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, তারপরে একটা ডোবা। ডোবার ওদিকে বাঁশবনের পরে আর মানুষের বসতি নাই, বহুদূর বিস্তৃত শস্যক্ষেত আষাঢ়ের গোড়াতেই এখন অর্ধেকের বেশী জলে ডুবিয়া গিয়াছে। বাঁশবনে জেলেপাড়ার প্রায় সকলেরই পরিচিত একজোড়া পাঁচফুট লম্বা গোখুরা সাপ বাস করে। ডোবায় থাকে কয়েকটি গোসাপ।

বড় ঘরখানায় সভা রীতিমতই বসিয়াছিল। ঘরে ঢুকিয়া কুবের অবাক হইয়া দেখিল, সভাপতি রাসু নয় হোসেন মিয়া। পীতমের কাটের সিন্দুকটার উপরে কাথা ভাঁজ করিয়া পাতিয়া হোসেনকে বসিতে দেওয়া হইয়াছে। রাসু মিশিয়া গিয়াছে একেবারে ভিড়ের মধ্যে। সকলের মুখেই একটা দারুন অস্বস্তির ভাব, আড়চোখে সকলে হোসেন মিয়ার দিকে চাহিতেছে। এতগুলি লোকের নিঃশ্বাসে ঘরের আবদ্ধ বাতাস হইয়া উঠিয়াছে দূষিত, গরমে হোসেন মিয়ার কপালে বড় বড় ফোঁটায় জমিয়া আছে ঘাম। এদিকে ওদিকে চাহিয়া কুবের টপ করিয়া সকলের পিছনে বসিয়া পড়িল। হোসেন মিয়া এখানে আসিয়া জুটিল কোথা হইতে?

এত লোকের সামনে রাসুর সঙ্গে যখন তাহার মুখোমুখি হইয়া গিয়াছে, কী কাণ্ডটা আজ হয় দেখো।

কুবের বিষাদ বোধ করে। আহা এতবড় একটা কর্মঠ শক্তিশালী লোক, এগুয়ে সম্মানকামি লোক, কপালের ফেরে বড় জব্দ হইয়া গেল। রাসু তাহাকে একেবারে হাতে-নাতে ধরাইয়া দিয়াছে সকলের কাছে। যে এত প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছিল, আজ বুঝি তার মুখ ফুটিয়া কথা বলিতেও বাধিতেছে। সোজাসুজি অপমান করিবার সাহস হয়ত কাহারো হয় নাই, কিন্তু কৌশলে নানাভাবে নানা ইঙ্গিতে কত লজ্জাই লোকটাকে সকলে না জানি এতক্ষণ দিয়াছে। কুবের এমনি মমতাবোধ করে যে সে ভাবিতে থাকে, পারিলে আজ সে হোসেন মিয়ার পক্ষই লইত। লোভ দেখাইয়া আশ্বাস দিয়া হোসেন মিয়া যে রাসুর স্ত্রী-পুত্রকে সুদূর ময়নাদ্বীপে লইয়া গিয়া হত্যা করিয়াছে, কোন্ যুক্তিতে তাহার কীর্তি সে সমর্থন করিত কুবের তাহা জানে না। সে যাকে ভয় করে, এত লোকের সামনে তার মাথা হেঁট হইয়া যাওয়ায় মনে মনে সে শুধু ব্যথা পাইতেছিল। অন্ধ আবেগের সঙ্গে তার মনে হইতেছিল, যারা পঙ্গু,অসহায় জীব, শক্তিকে লজ্জা দেওয়া তাদের পক্ষে ভাল কথা নয়—মানুষের ধর্ম বিরুদ্ধ এ কাজ।

একথা কুবের জানে যে হোসেন মিয়ার বিচার করিয়া শাস্তি-বিধানের কল্পনা জেলেপাড়ার এই সমবেত মাতব্বরেরা করিবে না। তবু আজ এই সমষ্টি বিচারকের ভঙ্গি গ্রহণ করিয়াছে। কী স্পষ্টভাবেই না হোসেন মিয়াকে অপমান করিতেছে সকলের বসিবার ভঙ্গি, চাহিবার ভঙ্গি, চুপ করিয়া থাকার ভঙ্গি।

বিচলিত ও উত্তেজিত হইয়া এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে কুবের দেখিতে পাইল জহর, আমিনুদ্দি এবং আরও দুজন মুসলমান মাঝি অত্যন্ত গম্ভীরমুখে এদিকে বসিয়া আছে। ধরিতে গেলে এরাই কেতুপুরের মুসলমান মাঝির সমাজ, আরও দু-চারজন যারা আছে তারা একান্ত নগণ্য। এদের সংখ্যা পাঁচ-ছয় ঘরের বেশী হইবে না। জেলেপাড়ার পূর্বদিকে এদের একত্র সন্নিবেশিত বাড়িগুলিকে বেড়ার বাহুল্য দেখিয়া সহজেই চিনিতে পারা যায়। মেয়েদের বাহিরে না আসিলে চলে না। নদীতে জল আনিতে যাইতে হয়, পুরুষেরা কেহ বাড়ি না থাকিলে দোকানে সওদা আনিতে যাইতে হয়। বাড়ির আনাচে-কানাচে লাউ-কুমড়া ফলিলে, মুর্গীতে ডিম পাড়িলে, গ্রামে গিয়া বেচিয়া আসিতে হয়। বেড়াগুলি পর্দা রাখে শুধু অন্দরের আর এমন বৌ-ঝি বাড়িতে যদি কেহ থাকে, যাহার বয়স খুব কাঁচা—তাহার। এরা এবং জেলে পাড়ায় অমুসমান অধিবাসীরা সদ্ভাবেই দিন কাটায়। ধর্ম যতই পৃথক হক দিনযাপনের মধ্যে তাহাদের বিশেষ পার্থক্য নাই। সকলেই তাহারা সমভাবে ধর্মে চেয়ে এক বড় অধর্ম পালন করে—দারিদ্র্য। বিবাদ যদি কখনও বাধে, সে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিবাদ, মিটিয়াও যায় অল্পেই। কুবেরের সঙ্গে সিধুর যে কারণে বিবাদ হয়, আমিনুদ্দিনর সঙ্গে জহরের যে কারণে বিবাদ হয়, কুবের-আমিনুদ্দির বিবাদ হয় সেই কারণেই। কুব খানিকটা গলাগালি ও কিছু হাতাহাতি হইয়া মীমাংসা হইয়া যায়।

মধ্যস্থ হয়তো করে জহর মাঝিই।

বলে, কুবের বাই ছাড়ান দাও। আরে হোই আমিনুদ্দি, সামাল দে। পোলাপানের পারা কাইজা করস, তগর শরম নাই?

কুবের লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য হইল, এই আমিনুদ্দি আজ একটি বিশিষ্ট ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছে। হোসেন মিয়ার দিকে সে চাহিয়া নাই, সে চাহিয়া দেখিতেছে আমিনুদ্দিকে। আমিনুদ্দির অস্বস্তিও অত্যন্ত সুস্পষ্ট। জহরের মধ্যস্থতায় অনেকবার বিবাদ মিটিলে ও মনে মনে আমিনুদ্দির উপর কুবের রাগ ছিল। চোখে চোখে মিলিতে সে চোখ ফিরাইয়া লইল।

কেহ কথা কহে না। কী ভাবিয়া হোসেন মিয়া হঠাৎ কুবেরকেই বিলম্বিত সম্ভাষণ জানাইয়া বসিল ঃ

পিছে বইলা ক্যান কুবের বাই? আগাইয়া বও। খানাপিনা হয় নাই?

কুবের হঠাৎ বড় উল্লাস বোধ করিল। আগাইয়া সকলের সামনে গিয়া বসিয়া বলিল, খাইছ মিয়া বাই।

বাঁ হাতে নিজের লালচে দাড়ি মুঠা করিয়া ধরিয়া হোসেন মিয়া বলিল, গণেশেরে দেহি না? গেছে কই?

কেডা জানে? ফিরতি বেলায় মেলার মদ্যি মাইজা কর্তা ডাইকা কয়, গাঁয়ে ফেরস নাকি গণেশ? মাছগুলা বাড়িতে গিয়া আসিস, লইয়া যা। কইয়া একডালা ইলসামাছ দিলেন। মাছ দিবার লাইগা গণশা কর্তাগো বাড়িতে গেছে সন্দ করি।

মেজকর্তার নাম অনন্ত তালুকদার। কেতুপুর গ্রামখানি তাহারই। জেলেপাড়ায় যাহারা দু-এক বিঘা জমি রাখে, মেজকর্তাকেই তাহারা খাজনা দিয়া থাকে। মেজর্তার নামোল্লেখে সকলে মন দিয়া কুবেরের কথা শুনিল। হোসেন মিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কর্তা আলেন কবে?

আলেন আর বিষ্যুদবারে।

হীরুমাঝি চোখ মিটমিট করিতে করিতে বলিল, মাইজা কর্তার সকল সংবাদ দেহি রাখস কুবের, ভুবন সার লগে মামলার কী হইল ক দেহি?

কুবের বলিল, কর্তা হাঁসচরের দখল পাইছেন। ভুবন সার নায়েব নাকি কয়েদ হইছে শুনি জ্যাঠা। সাঁইথির কুঞ্জ গোসাঁই সাক্ষী দিছে; স্যায় নাকি নিজের চোখে নায়েবরে কর্তাগো কাছারিঘরে আগুন দিতি দেখিলো।

পীতম বলিল, হ? তুই জানলি কিবা?

কুবের সগর্বে বলল, ইডা কী জিগাও মামা? আমার জাননের বাকি কী। শেতলবাবুর ঠাঁই জানলাম।

শীতলের নামোল্লেখে পীতম মাঝি নিঝুম হইয়া গেল। নকুল শয়াতানি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, শেতলবাবু? তেনারে পালি কই কুবের?

কুবের হাসিয়া বলিল, নকুলদা য্যান পোলাপান, জান না কিছু। শেতলবাবু ঠাঁই পয়সা পামু, কাল হইতে আমাগোর যুগীর বাড়িতে তাগিদ দিবার গেছিলাম। পয়সা দিবার মতলব ডাকাইতটার নাই, খাতির কইরা কইলম বয় রে কুবের, তামুক খা। তামুক টানি রাইজ্যের গল্প কইলা আইলাম। কইলি না পিত্যয় যাবা নকুলদা, শেতলবাবু কয়, মাইজাবাবু দেনায় ডুবছে।

বুড়া পীতম মাঝি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, নকুল তখনো শয়তানি করিয়া বলিল, যুগীর না পোলা হইব কুবির?

কুবের বলিল, কেডা জানে? মুটাইছে দেখলাম।

কে জানে, কী আশ্চর্য ইহাদের উপভোগ্য রসিকতা। যুগী পীতম মাঝির মেয়ে, সম্প্রতি জেলেপাড়ারই একধারে একখানা ঘর বাঁধিয়া মেজকর্তার মুহুরী শীতল ঘোষের সঙ্গে বাস করিতেছে। এত লোকের মাঝে পীতমের সামনেই তাহার সম্বন্ধে নকুল যেমন অনায়াসে রসিকতা, করে, সকলে হাসাহাসি করিয়া তাহা উপভোগও করে বিনা বাধায় ও বিনা দ্বিধায়।

পীতম রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলে, বাইর হ তুই আমার বাড়ির থেইকা নকুইলা, দূর হ।

নকুল মুচকি হাসিয়া বলে, গোসা কর ক্যান মামা। জবাব দিবার পার না মাইঝা কর্তা কুবিররে এত খাতির করে ক্যান—তাই জিগাইয়া? কুবিরের পোলা কেমন ধলা হইছে জিগাও।

কুবের মুষ্টি তুলিয়া বলে, মারুম কইলাম নকুইলা, মাইরা লাশ করুম তরে।

মনে হয়, সভার চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে। রাসুর ও হোসেন মিয়াকে উপলক্ষ্য করিয়া সভার যে চাপা অসন্তোষে ও প্রতিবাদের ভাব আসিয়াছিল প্রসঙ্গান্তরে এখন তাহা বিলীন হইয়া গিয়াছে। ও বিষয়ে আর কাহারো কিছু বলিবার বা ভাবিবার নাই। হোসেন মিয়া উঠিয়া বিয়ানে একবার বাড়িতে যাইও রাসু বাই। পয়সাকড়ি পাইবা মালুম হয়, নিকাশ নিয়া খারিজ দিমু। ময়নাদ্বীপির জমিন না নিলি জঙ্গল কাটনের মজুরি দিই—খাওন-পরন বাদ। কাইল যাইও। লালচে দাড়ির ফাঁকে হোসেন মিয়া মৃদু হাসে, বলে, মনে করতিছ, হোসেন মিয়া ঠক। তোমারে

ঠকাইয়া হোসেন মিয়ার পয়দা কিসির? কোন হালারে আমি জবরদস্ত ময়নাদ্বীপি নিছি? আপনা খুশিতে গেছিলা, ঝুট না কলি মানবা রাসু বাই। ফিরা আইবার মন ছিল, আমারে কতি পারলা না? একসাথে আইতাম?

রাসু ঘাড় নীচু করিয়া থাকে। আমিনুদ্দি বলে, যান নাকি মিয়া?

হ।

শোনেন। আমি ময়নাদ্বীপি যামু না কইয়া থুইলাম।

হোসেন মিয়া তেমনি মৃদু মৃদু হাসে।

তোমারে যাতি কই নাই আমিনুদ্দি। খুশ না হলি ক্যান যাবা?

পাতলা পাঞ্জাবি ঘামে ভিজিয়া যাওয়ায় হোসেন মিয়ার বুকের নিবিড় লোমরাজি দেখা যাইতেছিল। সেইখানেই হাত দিয়া সে আবার বলিল, জান দিয়া তোমাগো দরদ করি, অ্যানে আইজ তোমরা ঘা দিলা, এই দিলের মদ্যি।—কুবের বাই, ঘর যাইবা নাকি?

কুবের সায় দিয়া উঠিয়া আসিল। দুজনে গোয়াল পার হইয়া নামিয়া গেল পথে। আকাশ নিবিড় মেঘে ঢাকিয়া গিয়াছে, দুর্ভেদ্য অন্ধকারে জেলেপাড়ার পথ পায়ের তলেও হইয়া আছে অদৃশ্য। অত্যন্ত সন্তর্পণে পা ফেলিয়া আগাইতে হয়, দীর্ঘকালের পরিচয় না থাকিলে বাড়ির আনাচ-কানাচ দিয়া আকাবাঁকা পথ তাহারা খুঁজিয়া পাইত না। কুবেরের বাড়ি কাছাকাছি আসিয়া আকাশের জমানো মেঘ হঠাৎ গলিয়া যাওয়ায় চোখের পলকে তাহারা ভিজিয়া উঠিল। কুবেরের সঙ্গে হোসেন মিয়াও উঠিল গিয়া তাহার ভাঙা কুটিরে।

দাওয়ায় ছাট আসিতেছিল, হোসেন মিয়াকে ঘরের মধ্যেই বসিতে দিতে হইল। কুবেরের দুই ছেলে লখা ও চণ্ডী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, জাগিয়া ছিল গোপী। চাটাইয়ের উপর জাঁকিয়া বসিয়া হোসেন মিয়া তাহাকে আদর করিয়া কাছে ডাকিল, বলিল, পিয়াস জানায় বিবিজান, পানি দিবা না? গোপী ঘটিতে জল আনিয়া দিলে আলগোছে মুখে ঢালিয়া ঘটিটা দাওয়ার প্রান্তদেশে রাখিল। ঘরের চাল বাহিয়া যে জলের ধারা পড়িতেছিল, আঁজলা ভরিয়া সেই জল ধরিয়া ঘটির গায়ে ঢালিয়া ঢালিয়া ঘটিটা গোপী করিয়া লইল শুদ্ধ।

রাত্রি বাড়িতে থাকে, বৃষ্টি ধরিবার লক্ষণ দেখা যায় না। পিসী ঢেঁকি ঘরে গিয়া ঝাঁক বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়ে, ভাইদের পাশে শুইয়া গোপীর দুচোখ ঘুমে জড়াইয়া আসে, শ্রান্ত কুবেরের চোয়াল ভাঙিয়া হাই উঠে, বাহিরে চলিতে থাকে অবিরাম বর্ষণ। কিছুক্ষণ বৃষ্টি হইবার পর ঘরের ফুটা কোণ দিয়া ভিতরে জল পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, চাহিয়া দেখিয়া হোসেন মিয়া আপনা হইতে কাল সকালেই কুবেরের ঘর ছাইবার শণ দিবার কথা বলিয়াছে। কুবের এক সময় উঠিয়া গিয়া মালার অবস্থা দেখিয়া আসে। বহু যত্নে কুবের তাহার আঁতুড়ের চারিদিকে বেড়ার সমস্ত ফুট বন্ধ করিয়াছে, দাওয়ার এদিকটা ভাসিয়া গেলেও আঁতুড়ে বৃষ্টির ছাট ঢুকিবার কোন পথ নাই। মেঝেটাই শুধু হইয়া আছে ভিজা স্যাঁতসেঁতে যার কোন প্রতিকার করার সাধ্য কুবেরের নাই। আর কটা দিন পরেই মালা এখান হইতে মুক্তি পাইবে। বুকে পিঠে তাহার যে অল্প ব্যথা হইয়াছে, কদিন এখানে থাকার ফলে সেটা বাড়িয়া না গেলেই বাঁচা যায়।

মালা ভয়ে ভয়ে বলে, আমারে দুগা মুড়ি-চিড়া দিবা গো?

ক্যান, ভাত খাস নাই?

খাইছি। ভাতে টান পড়ল, পেট ভইরা খাই নাই। অখন খিদায় পেট জ্বলে।

জ্বালাইয়া মারস বাপু তুই। বলিয়া কুবের কলসী খুঁজিয়া পিসীর নিজের জন্য লুকানো কতকগুলি চিড়া মালাকে আনিয়া দেয়। উঠিয়া বসিয়া অন্ধকারে চিড়া মুখে দিয়া মালা বলে, হোসেন মিয়াকে খাইতে দিবা না?

কী দিমু?

মেলার থেইকা আম না আনছিলা? তাই দাও—করবা কী? খিদায় মানুষটা খুন হইয়া যায় না।

কুবেরের সহসা মনে পড়িয়া যায়। ভাবে, সিধুর কাছ হইতে যে মাংসের ব্যঞ্জন পাওয়া গিয়াছে তাই দিয়া আতিথ্য করিলে মন্দ হয় না। মুসলমান মানুষ মাংস বেশ পছন্দ করিবে। কিন্তু পরক্ষণেই এ বিষয়ে কুবেরের উৎসাহ কমিয়া যায়। এমন একদিন ছিল হোসেন মিয়া খাইবে? শুধু না-খাওয়া নয়, খাইতে বলিলে হয়তো সে আজ অপমানই বোধ করিয়া বসিবে। তার চেয়ে আম যখন আছে, তাই দেওয়া ভাল।

ঘরে গিয়া কুবের একটু অবাক হয়। চাটাই-এ চিত হইয়া শুইয়া ইতিমধ্যেই হোসেন মিয়া ঘুমাইয়া-পড়িয়াছে। কুবের সন্তর্পণে মৃদুস্বরে একবার বলে, মিয়া বাই। সাড়া না পাইয়া ঠেলা দিয়া ঘুম ভাঙায় গোপীর।

সিধুর ঠাঁই ব্যানুন আনছিলি গোপী?

ঘুমে আধমরা গোপী বলে, উহুঁ।

উহুঁ! আনতি কইয়া গেলাম না হারামজাদী?

বাহুমূলে কুবেরের জোর টিপুনিতে গোপী চমকিয়া সজাগ হইয়া বসে। বলে, আনতি গেছিলাম বাবা। দিল না। কইল, বিড়ালে সব খাইয়া গেছে গা।

বিড়ালে খাইয়া গেছে কইল, না?

গোপী সায় দিল। কুবের রাগে আগুন হইয়া বলিল, হালা জুয়াচ্চোর। র, বিয়ানে খাওয়ামুনে বিড়ালরে। হালা বজ্জাইত!

ছাড়া পাইবা মাত্র গোপী ঢলিয়া পড়ে। ঘুম বোধহয় আসে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই। ঘরের যে কোণে জল পড়িতেছিল কুবের সেখানটা পরীক্ষা করিয়া দেখে। জল বাহির হইয়া যাইবার জন্য সেখানে সে একটি সরু নালী করিয়া দিয়াছিল, মাটি গলিয়া তাহা প্রায় বুজিয়া আসিয়াছে। জল জমিয়া ঘরের ভিতরের দিকে আগাইয়া আসিয়াছে অনেক দূর। হাত দিয়াই নালাটা সাফ করিয়া দেয়। তারপর এক গভীর সমস্যার কথা ভাবিতে থাকে। ডিবরিতে বেশী তেল নাই। অল্পক্ষণের মধ্যেই নিভিয়া যাইবে। হোসেন মিয়াকে ডাকিয়া তুলিয়া আম খাওয়ার অনুরোধ এখন সে জানাইবে কি? বাদলা নামিয়া ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। লোকটা আরামে গভীরভাবে ঘুমাইতেছে। ডাকিলে চটিবে না তো?

ঘুমের মধ্যে হোসেন মিয়া পাশ ফিরিল। হঠাৎ কুবের কী আবিষ্কার করিয়াছে। হোসেন মিয়ার লম্বা পাঞ্জাবির পকেট হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে আনকোরা নূতন একটু টাকা-পয়সা রাখিবার ব্যাগ! ব্যাগটা যে আজই মেলায় কিনিয়াছে সন্দেহ নাই। শখ করিয়া নূতন ব্যাগে কত টাকা-পয়সা হোসেন মিয়া রাখিয়াছে কে জানে, ব্যাগটা ফুলিয়া মোটা হইয়া গিয়াছে।

কুবেরের দেহে কাঁপুনি ধরিয়া যায়। একমুঠো টাকা ও রেজকি হইতে প্রথমে একটা আধুলি ছাড়া আর কিছু লইতে সাহস পায় না। তারপর সে ভাবিয়া দেখে যে এতগুলি খুচরা রেজকি কি আর হোসেন মিয়া হিসাব করিয়া গুণিয়া-গাঁথিয়া রাখিয়াছে? আরও কটা সিকি এবং একটা আনি সে বাহির করিয়া লয়।

ব্যাগটা হোসেন মিয়ার লম্বা পাঞ্জাবির পকেটে ঢুকাইয়া ফুঁ দিয়া সে ডিবরিটা নিবাইয়া দেয়। তখন এটা ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়া যায়।

গোপী রুদ্ধনিঃশ্বাসে বলে, বাবা!

কুবেরের দেহ শিরশির করে, মেরুদণ্ডটার ঠিক মাঝামাঝি।

চুপ যা গোপী, ঘুম যা।

আমারে কাইল পয়সা দিবা?

দিমু—চুপ যা, ঘুম যা গোপী।

গোপী আর কথা বলে না। অন্ধকারে দুহাত-লম্বা ছোট চাটাইটি সন্তর্পণে বিছাইয়া কুবের শুইয়া পড়ে।

তিন

ভোরে আগে ঘুম ভাঙিল হোসেনের। কুবেরকে সেই ডাকিয়া তুলিল. চোখ মেলিয়াই কুবেরের কেন যে হঠাৎ এক অকারণ ত্রাসে মন ভরিয়া গেল। কী হইয়াছে? বিপদ কিসের? হ, কাল রাত্রে সে হোসেন মিয়ার পয়সা চুরি করিয়াছিল। একদফা চোখ মিটমিট করিয়া কুবের আশ্বস্ত হইল। হোসেন মিয়াকে খাতির করিয়া বলিল. যান নাকি মিয়া বাই? খিদায় কাতর হইছেন, সন্দ করি—রাইতে কিছু খান তা নাই। এক কাম করেন দুইগোটা আম খাইয়া যান।

প্রত্যুষে ঘুমভাঙা মুখেও হোসেন মিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে পারে।

খাওনের কথা থোও কুবির বাই। বাড়িতে গিয়া খামু।

একটা প্রকাণ্ড হাই তুলিয়া বিড়ি ধরাইয়া হোসেন উঠিল। গোপীর দিকে এক নজর চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মাইয়ার বয়স কত, কুবির বাই?

নয় সন্দ কইরা থুইছি।

বিয়া দিবা না মাইয়ার?

হ। দিমু, কেরমে কেরমে দিমু!

পকেট হইতে হোসেন ব্যাগটা বাহির করিয়া খুলিল। দেখিয়া পাংশু হইয়া গেল কুবেরের মুখ। কিন্তু না, টাকা পয়সা গুণিয়া দেখিবার জন্য হোসেন ব্যাগ বাহির করে নাই। একটি সিকি বাছিয়া লইয়া সে কুবেরের হাতে দিল, বাচ্চাগো খাবার কিনা দিও কুবির বাই। বলিয়া ব্যাগটা আবার পকেটে রাখিয়া দিল। কুবের আত্মসম্বরণ করিল তৎক্ষণাৎ। যে বিপদ ঘটিল না তার জন্য আর কেন বুক কাঁপিবে, মুখ শুকনো দেখাইবে? খুশিতে বেসামাল হইয়া সে জিজ্ঞাসাই করিয়া বসিল, ব্যাগটা নতুন দেখি? মেলায় কিনছেন বুঝি কাইল?

হোসেন বলিল, হ।

কথা কহিতে কহিতে দুজনে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। এখন বৃষ্টি নাই মেঘে মেঘে প্রভাতের রূপ অস্বাভাবিক থমথমে। হোসেন একবার মুখ তুলিয়া আকাশের দিকে তাকাইল। ইয়া আল্লা, নামানো আকাশের তলে কী দীনা এই পৃথিবী! ভিজিয়া চুপসিয়া চারিদিকে সকাতর হইয়া আছে। হোসেনের মনের কোণে একটু স্বাভাবিক কবিত্ব ছিল, জীবনে ভিন্ন অবস্থায় পড়িলে হয়তো সে কয়েকটি গীতিকা রচনা করিত, তার মধ্যে দুটি একটি মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া স্থান পাইত শতাব্দীর সঞ্চিত গ্রাম্যগীতিকার অমর অলিখিত কাব্যে—মাঠে-ঘাটে, মশালের আলোয় আলোকিত উঠানে গীত হইয়া ভণিতায় হোসেনের নাম দূর দূরান্তর ছড়াইয়া পড়িত, লোকে বলিত হোসেন ফকির, চল কেতুপুরে দেওয়ান ফকির হোসেন ছাহাবের দরগায় চেরাগ জ্বালি। হোসেন বুঝি কুবেরকে একেবারে ভুলিয়া যায়। অনেক দিন আগে কুবেরের মত ছেঁড়া কাপড় পরিয়া আধপেটা খাইয়া জলে কাদায় সে যখন দিন কাটাইত, সকাল সন্ধ্যায় তখন মনে তাহার ভাসিয়া আসিত গানের চরণ। ফুটা চালার নীচে ময়লা চাটাইয়ের বিছানায় উদরে উপবাস লইয়া তেমনিভাবে কাল রাতটা কাটাইয়া আজ আবার হোসেনের মনে গান ভাসিয়া আসিতেছে।

কুবের, গাহান বাইন্ধবার পার?

আমি পারতাম না। আমাগোর যুগইলা পারে। মুখে মুখে ছড়া বাইন্ধ্যা দে।

আমি বাইন্ধবার পারি।

কন কী মিয়া বাই?

হোসেন এখন লাজুক। সে এদিকে ওদিক তাকায়। ঘন ঘন দাড়িতে হাত বুলাইয়া কুবেরের কাছেই অপরাধীর মতে হাসে। লোকটার আদি অন্ত পাওয়া ভার।

তারপর হোসেন বলে, বাঁধুম, শুনবা?

কুবের বলে, কন মিয়া বাই, কন।

একটু চুপ করিয়া হোসেন সুর করিয়া বলিতে আরম্ভ করেঃ

আঁধার রাইতে আশমান জমিন ফারাক কইরা থোও
বোনধু কত ঘুমাইবা।
বাঁয়ে বিবি ডাইনে পোলা অকাল ফসল রোও
মিয়া কত ঘুমাইবা।
মানের পাতে রাইতের পানি হইল রুপার কুপি,
উঠ্যা দেখবা না।
আলা করেন ঘরের চালা কেডা চুপি চুপি।
দিশা রাখবা না।
তোমার লাইগা হাওর দিয়া বাইয়া চেরাগ-নাও
দিল-জাগানি আলেন যিনি, মিয়া,
চিরা-মেঘের বাদাম তুইলা বন্ধু কনে যাও?
—জিগায় তারে খাঁচার চিড়িয়া।
নিদ্ ভাঙ্গে না, দিল জাগে না, বিবির বুকের শির,
পাড়ি দিবার সময় গেল, মাঝি তবু থির—
মাঝি কত ঘুমাইবা।

কুবের অভিভূত হইয়া বলিল, মুখে মুখে বানাইলেন মিয়া বাই?

খুশ হলি না পারি কী? হোসেন মিয়া আর দাঁড়াইল না। দুপুর বেলা ঘরের চালের জন্য শণ আনিতে গিয়া কুবের শুনিল, সে বিদেশে গিয়াছে। কোথায় গিয়াছে কেহ জানে না। কিন্তু হোসেন মিয়ার কথা কখনো বেঠিক হয় না। কুবেরের জন্য শণ সে রাখিয়া গিয়াছে।

গোপীর বয়স এগার, কুবের মেয়ের এক বছর ভাঁড়ায় আর এক বছর হাতে রাখিয়া বলে— নয়। ন বছর বয়সে যে মেয়ের এগার বছরের বাড়, বিয়ের বাজারে তার দাম আছে। গণেশের শালা যুগল সম্প্রতি পাশের গ্রাম হইতে বোনের তত্ত্ব লইবার ছলে আসা-যাওয়া শুরু করিয়াছে। সোজাসুজি কথা সে কখনো পাড়ে নাই, আলাপ আলোচনার মাঝখানে বাঁকা বাঁকা প্রশ্ন করিয়া কুবের কী রকম দর হাঁকিবে জানিবার চেষ্টা করিয়াছে। স্পষ্ট করিয়া কুবেরও এখন পর্যন্ত কিছু বলে নাই। কথা উঠিলে বহুক্ষণ ধরিয়া মেয়ের প্রশংসা কীর্তন করিয়া শুধু একটু আভাস দিয়াছে দুকুড়ি তিনকুড়ি টাকার। বুদ্ধি থাকে যুগল আন্দাজ করিয়া নিক। গণেশের আত্মীয় বলি টাকার বিষযে কুবের তাহাকে খাতির করিবে না। যুগল সম্ভবত তাহা টের পাইয়াছে, তাই ইলিশ মাছের মরসুমটা শেষ হইবার প্রতীক্ষায় আছে। হাতে তখন কী রকম টাকা জমে দেখিয়া কথা পাড়িবে। কুবের বোঝে না কি! সকলের গোপন মতলব সে চোখের পলকে আঁচ করিয়া ফেলে।

মানুষ মন্দ নয় যুগল। এতকাল অবস্থা খারাপ ছিল, তাই বত্রিশ বছর বয়স অবধি বিবাহ করিতে পারে নাই। নিজের চেষ্টায় এখন সে অবস্থা ভাল। উন্নতির জন্য তাহার প্রশংসনীয় প্রয়াসের কথা কাহারো অবিদিত নয়। দুটি একটি করিয়া কতকাল ধরিয়া কতকষ্টে সে কিছু টাকা জমাইয়াছিল, তারপর গণেশের কাছে বোনের বিবাহ দিয়া পাইয়াছিল তেইশ টাকা। সকলে ভাবিয়াছিল, এবার যুগর বিবাহ করিবে, বিবাহের জন্য ছাড়া অত কষ্টে টাকা জমায় কে? কিন্তু যুগল তা করে নাই। সমস্ত জমানো টাকা দিয়া একটা বড় নৌকা কিনিয়া সকলকে অবাক করিয়া দিয়াছিল। দুশো টাকা সে নৌকার দাম, সুতরাং টাকা সে কম জমায় নাই। ইচ্ছা করিলে ঐ টাকায় সে তিন-তিনটা বিবাহ করিতে পারিত। অন্তত একটা বিবাহ করিয়া বাকী টাকায় একটা ছোটখাট নৌকা কিনিতে কোন বাধাই ছিল না। তার বদলে উপার্জনের এই স্থায়ী উপায়ের জন্য সমস্ত পুঁজি ভাঙিয়া সে যে সুবুদ্ধি ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিল তার তারিফ করিতেই হয়। দেখো, এক বছরে যুগলের ভাঙাঘর নূতন হইয়াছে, শীর্ণ দেহে মাংস

লাগিয়াছে, বিবাহের জন্য টাকাও সে আবার জমাইয়া ফেলিতে পারিয়াছে কিনা কে জানে! জাহাজ ঘাটে অতবড় নৌকার না চাহিতে ভাড়া হয়। রেলে ও জাহাজঘাটে আসিয়া কত মানুষ
লাগিয়াছে, বিবাহের জন্য টাকাও সে আবার জমাইয়া ফেলিতে পারিয়াছে কিনা কে জানে! জাহাজ ঘাটে অতবড় নৌকার না চাহিতে ভাড়া হয়। রেলে ও জাহাজঘাটে আসিয়া কত মানুষ
ও কত মাল কত গ্রামে যায়,এক একটি বাণিজ্য-দ্রব্যের মরসুমের সময় কত মহাজন গ্রামে গ্রামে দাদন-নেওয়া মাল সংগ্রহের জন্য চড়াদরে অসংখ্য নৌকা ভাড়া নেয়। আর শুধু ভাড়া তো নয়। উপরি আয়ও কি কম! ধানের বোঝাই লইয়া এক দিনের পথ পাড়ি দিবার সময় দশ-বিশ সের ধান নৌকার গোপন ফাঁকে ফোকরে লুকাইয়া ফেলিবার সুযোগ মেলে ঢের। কেবল ধান নয়, কলাই, মটর, হলুদ লঙ্কা প্রভৃতি কত কী জিনিস বছর ভরিয়া যুগল অমন কত আনিয়াছে। উন্নতি সে আরও করিবে। কারণ, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে কোন বিষয়ে তাহার এতটুকু শিথিলতা আসে নাই। এখনো সে আগের মতই কৃপণ। আকুরটাকুরের মাঝি সমাজে আজ সে একজন মাতব্বর লোক। একদিন সে-ই যে গ্রামের মোড়ল হইয়া দাঁড়াইবে কেহ তাহাতে সন্দেহ করে না।

মালার ইচ্ছা বিবাহটা তাড়াতাড়ি চুকিয়া যায় গোপীর। এত বয়স হইল আর কতকাল বয়স ভাঁড়াইয়া মেয়েকে কুবের ঘরে রাখিবে? লোকে যে ইতিমধ্যেই নিন্দা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। স্বামীকে মালা তাগিদ দিয়া বলে, অগো, যুগাইলা নি কিছু কয়? কুবের তাহাকে চোখ ঠারিয়া বলে, কয় না!

কী কয়?

তা শুইনা তর কাম কী? মাইয়ালোক চুপ মাইরা থাক। পোলা বিয়ানের লাইগা পিরথিমিতে আইছস, বিয়া পোলা যত পারস—রাও করস কেন রে?

মালা রাগে বৈকি।

গাও-জ্বালাইনা কথা দেহি খইর-পারা ফোটে, যায় নি মুখে মধু দিছিল আঁতুড়ে?

গোসা হইলে মারুম গোপীর মা।

মারবা নাকি? আগে মার, মারা— না যদি মার লখার মাথা খাইবা।

কুবের ঝিমাইতে ঝিমাইতে নিদ্রাকাতর চোখে স্ত্রীর দিকে তাকায়। হ, ছেলে কোলে রোগা বৌটিকে তাহার রাজরানীর মত দেখাইতেছে বটে। কে জানে রাজরানী দেখিতে কেমন? ছেলেটাও যেন ফরসাই হইয়অছে মনে হয়, এমনি বয়সে লখা আর চণ্ডী যেমন তামাটে লাল রঙের ছির সে-রকম নয়। আঁতুড়ে যতদিন ছিল কুবের বিশ্বাস করে নাই, এখন তাহার মনে সন্দেহ আসিয়াছে যে ছেলেটা সত্যসত্যই খুব ফরসা হইবে। মালার রং কালো নয়, তামাটে—মাঝে মাঝে তাহাকে বাবুদের বাড়ির মেয়েদের মত ফরসাই দেখিয়া বসে। জেলেপাড়ায় কোন স্ত্রীলোকের গায়ে এমন চামড়া নাই। একটা পা যদি ওর হাঁটুর কাছ হইতে দুমড়াইয়া বাঁকিয়া না যাইত, কুবেরের ঘরে ও পায়ের ধুলা ঝাড়িতেও আসিত না। কিন্তু মালার চেয়েও ছেলেটার রঙ যে ঢের বেশী ফরসা হইয়াছে। আরও কিছু বড় হইলে বিবর্ণ হইয়া আসিয়া শেষ পর্যন্ত রঙ হয়তো ওর মালার মতই দাঁড়াইবে। তাই যেন দাঁড়ায়। কুবের তাই চায়। যতই সে শান্ত ও সুবিবেচক হোক, মাঝে মাঝে লোকের বিশ্রী ইঙ্গিতে গা জ্বালা করে বৈকি, মালার দিকে চাহিয়া কখনো কখনো মনে ঘনাইয়া আসে বৈকি একটা বিতৃষ্ণা-মেশানো ব্যথিত ক্রোধ! কুবেরের দৃষ্টি আরও ঘোলাটে হইয়া আসে। এখন শ্রাবণের এই প্রথম সপ্তাহে আকাশে মেঘের এক মুহূর্তের বিশ্রাম নাই। পরপর কয় রাত্রি অবিরাম জলে ভিজিয়া কুবের আবার জ্বর বোধ করিতেছে।

অনেকক্ষণ নীরবে কাটিয়া গিয়াছে, তবু থামিয়া যাওয়া আলোচনাটা আবার আরম্ভ করিতে কোনরকম ভূমিকার দরকার হয় না। এইমাত্র রাগারাগি হইয়া গিয়াছে! কে বলিল? কত শান্ত ও মোলায়েম কুবেরের গলার স্বর।

স্পষ্ট কইরা যুগল কিছু কয় না গোপীর-মা।

মালার গলাতে এতটুকু ঝাঁজ নাই।

কয় না? ক্যান? গোপীরে নিব না।

গণশা কয় নিব, যুগইলা কিছু কয় ন। উদিন আমারে জিগায় খোঁড়ার মাইয়া নি খোঁড়া হয়।

তুমি কি কইলা?

আমি কইলাম, তুই বলদ যুগইলা, খোঁড়ানি ব্যারাম যে মার থাকলি মাইরা পাইব? আমাগোর গোপীর চলন পরীর পারা। জান কি গোপীর-মা, গণশা মোরে এক বিষম বিত্তান্ত কয়। নকুইয়া গিয়া যুগইলার নাকি মন ভাঙে, বাঁকা-বাঁকা মাইয়ার খবর দিয়া আহে। যুগইলা য্যান দুই দশটা মাইয়ার খবর না নিয়া গোপীরে নিব না সন্দ করি, গোপীর-মা।

বলিয়া কুবের যেন ঘুমাইয়া পড়ে। কিন্তু মালা তাহাকে চেনে। সে প্রত্যাশা করিয়া থাকে।

জান নি গোপীর-মা আরেক বিত্তান্ত? রাসু গোপীরে নিব কয়।

মালা বিস্মিত হয় না। শুধু বলে, চালচুলা নাই।

সায় দিয়া কুবের বোধহয় এবার সত্যই ঘুমাইয়া পড়ে। কারণ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও মালা আর তাহার কোন মন্তব্য শুনিতে পায় না। বসিয়া বসিয়া ছেলেকে সে স্তন দেয়। রোয়াকের ওদিকে রান্নার জায়গায় বসিয়া পিসী গোপীর মাথার উকুন বাছিতেছে, সারারাত উকুনের কামড়ে মেয়েটা মাথা চুলকাইয়া সারা হয়। লখা ও চণ্ডী, হয় ডাংগুলি খেলিতে গিয়াছে, আর না হয় কোথাও বঁড়শি ফেলিয়া ধরিতেছে পুঁটিমাছ। যেখানেই ওরা থাক আর যাই করুক, জলে ভিজিয়া জ্বরে পড়িবে না, জলে ডুবিয়া মরিবেও না। সে ভয় মালার নাই। সে কেবল ভাবিয়া মরে, মারামারি করিয়া ছেলে দুটা কোন দিন না খুন হইয়া আসে। পঙ্গু বলিয়া বাহিরের জগতের সঙ্গে মালার পরিচয় কম। কেতুপুরের দশ মাইল উত্তরে চরডাঙা গ্রামের এমনি এক কুটিরে তার মায়ের এক বামুন ঠাকুরের নামে কানাকানি করা পাপের প্রমাণ স্বরূপ এই ভাঙা পা-টি লইয়া সে জন্মিয়াছিল, বড় হইয়াছিল বাড়ির মধ্যে, লাঠিতে ভর দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বাড়ির অদূরে রাম গোয়ালার গোয়ালঘরের কাছে কদমগাছটি পর্যন্ত ছিল তার কষ্টকর গতিবিধির সীমা। পাড়ার ছেলেমেয়েরা ঐ কদমগাছটির তলে খেলা করিত আর করিত মারামারি। বড় ছেলেরা ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে মারিয়া আর কিছু রাখিত না। অনেক সময় এইসব মারামারির শেষ ফলটা গড়াইত বয়স্কদের মধ্যে পাড়ায় মহামারী কাণ্ড বাধিয়া যাইত। দূরে দাঁড়াইয়া চোখ বড় বড় করিয়া মালা মজা দেখিত, বড় ভয় করিত তাহার। অন্য ছেলে মার খাইলে সে কিছুই. করিত না, কিন্তু যেদিন সকলে মিলিয়া তাহার ছোট ভাই দুটিকে পিটাইতে আরম্ভ করিত সেদিন খুলিত মুখ, তাহার বাঁশির মত সরু গলা শোনা যাইত পাড়ার সর্বত্র, সকলে ছুটিয়া আসিত। তার আগেই মালাকে কিন্তু দিতে হইত ভ্রাতৃপ্রেমের মূল্য। ভাইয়ের বদলে ছোঁচা খাইত সে। একজন একটা ধাক্কা দিলেই সে মাটিতে পড়িয়া যাইত। তখন চার-পাঁচজনে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া তুলিয়া তাহাকে ফেলিয়া দিত রাম গোয়ালার গোয়ালঘরের পিছনে গোবর-গাদায়।

সেই হইতে ছেলেদেরে মারামারিকে বড় ভয় করে মালা। নিজের ছেলে দুইটিকে সে ঘরে আটকাইয়া রাখিতে চায়। কিন্তু খাতির তাহাকে কেহ করে না। বসিয়া বসিয়া যাহার দিন কাটে কে তাহার মুখ চাহিবে, কথা শুনিবে? হাজার বারণ করুক মালা, লখা ও চণ্ডী চোখের পলকে উধাও হইয়া যায়। ফাঁকি দিয়া কাছে ডাকিয়া জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে গেলে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া একেবারে রক্তপাত করিয়া ছাড়ে। তবু প্রতিদিন মালা তাহাদের নানা ছলে কাছে রাখিবার চেষ্টার কামাই দেয় না। সন্তান-স্নেহের হিসাবে জেলেপাড়ার জননীদের মধ্যে মালার মৌলিকতা আছে। ছেলের বয়স আট-দশ বছর পার হইয়া গেলে তার সম্বন্ধে চিন্তা করা জেলেপাড়ার মেয়েদের রীতি না। চিন্তা করিবার অপরাপর বিষয়ের তাহাদের অভাব নাই। কচি

ছেলে ছাড়া মায়ের কোল খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। নিষ্ঠুর ছাড়া স্বামীও বড় একটা হয় না। দুটি কুঁড়েঘরের যে সংকীর্ণ সংসার, তারও কাজ থাকে অফুরন্ত। পুরুষেরা মাছ ধরিয়া আনে, পাইকারী কেনা বেচা করে, চুপড়ি মাথায় করিয়া বাড়ি বাড়ি মাছ যোগান দেওয়া তাদের কাজ নয়। ও কাজটা জেলেপাড়ার মেয়েরা সন্তানপ্রসবের আগে পিছে দু-একটা মাস ছাড়া বছর ভরিয়া করিয়া যায়। অপোগণ্ড শিশু ছাড়া আর কোন সন্তানের ছোট ছোট বিপদ-আপদের কথা ভাবিবারও যেমন তাহাদের সময় নাই, ওদের স্নেহ করিবার মত মানসিক কোমলতাও নাই। নবজাত সন্তানকে তাহারা যেমন পাশবিক তীব্রতার সঙ্গে মমতা করে, বয়স্ক সন্তানের জন্য তাহাদের তেমনি আসে অসভ্য উদাসীনতা। ছেলে মরিয়া গেলেও শোক তাহারা করে না, শুধু সুর করিয়া মড়াকান্না কাঁদে। মালা পঙ্গু, অলস। ঘরের কোণায় সে স্বতন্ত্র জীবনযাপন করে, জেলেপাড়ার রূঢ় বাস্তবতা তাই তাকে অনেকটা রেহাই দিয়াছে। ছেলেমেয়েগুলিকে ভালবাসিবার মনও তাহার আছে, সময়ও সে পায়।

ছেলেদের সে ফিরিয়া পায় সন্ধ্যার পর। সারাদিন পরে পাখির ছানার মত অবসন্ন ছেলে দুটি ফিরিয়া আসে ঘরের কোণায়, খোঁড়া মাকে তখন তাদের প্রয়োজন হয়। জেলেপাড়ার প্রত্যেকটি কুটীরে যে অভিনয় অজানা, প্রতি দিনান্তে কুবেরের ঘরে তাহার অভিনয় হয়। বাহিরে সবটুকু শয়তানি অপচয় করিয়া লখা ও চণ্ডী শান্ত হইয়া তাকে, ভদ্র ও বাধ্য ছেলের মত ঘেঁষিয়া আসে মায়ের কাছে। সারাদিন মালার যে একতরফা অবহেলিত স্নেহ খাপছাড়া লাগিতেছিল অপর পক্ষ গ্রহণ করামাত্র তাহা মধুর ও অপূর্ব হইয়া উঠে। মালার কাছে বসিয়া তাহারা ভাত খায়, এক ছেলের মুখে স্তন গুঁজিয়া রাখিয়া আর দুজনকে ভাত মাখিয়া গ্রাস মুখে তুলিয়া খাওয়ানোর শখ মালার একার নয়, এমনিভাবে খাওয়াইয়া না দিলে ওরা খাইতে চায় না। মালা রূপকথা বলে। মালার মাথায় উকুন, গায়ে মাটি, পরনে ছেঁড়া দুর্গন্ধ কাপড়, তাই এ সময়টা সে যে কত নিখুঁত ভদ্রমহিলা, অসামঞ্জস্য তাহা স্পষ্ট করিয়া দেয়। লখা ও চণ্ডী উলঙ্গ, চকচকে ভিজা-ভিজা গায়ের চামড়া। ডিবরির শিখাটি ঊর্ধ্বগ ধোঁয়ার ফোয়ারা, মাথার উপরের চাল পচা শণের, চারি পাশের দেয়ালে চেরা বাঁশের স্যাঁতসেতে মাটির মেঝে। আদিম অসভ্যতার আবেষ্টনী। অভিনয় সুমার্জিত সভ্যতার।

ইলিশের মরসুমে কুবের এসময় বাড়ি থেকে কদাচিৎ। যেদিন থাকে সেদিন বড়লোকের বাড়ির পোষা কুকুরের মত উদাস চোখে এসব সে চাহিয়া দেখে, স্নেহ-মমতার এইসব খাপছাড়া কাণ্ডকারখানা। দেখিতে দেখিতে সে হাই তোলে, বড়লোকের পোষা কুকুরের মতই চাটাই-এ একটা গড়ান দিয়া উঠিয়া বসে, মুখখানা করিয়া রাখে গম্ভীর। লখা ও চণ্ডীর মত সেও মন দিয়া যে রূপকথা শুনিতেছে মালার তাহা টের পাইতে বাকি থাকে না। ছেলেরা ঘুমাইয়া পড়িলেও সে তাই থামে না, হাত নাড়িয়া মুখভঙ্গী করিয়া রস দিয়া ঘুমন্ত ছেলেদের গল্প বলিতে থাকে। গল্প বলিতে সে ওস্তাদ। একই গল্প বার বার বলিয়া শ্রোতাদের সে সমান মুগ্ধ করিতে পারে। গোপী সরিতে সরিতে মার গা ঘেঁষিয়া আসে। পিসী ঠায় বসিয়া থাকে দুয়ারের কাছে। মালার গল্প শুনিতে আরও কে কে আসিয়া পড়িয়াছে দেখো। গণেশের বৌ উলুপী, ছেলে মনাই আর মেয়ে কুকী। আর আসিয়াছে সিধুর তোতলা হাবা মেয়ে বগলী। কথা বলিয়া কেহ মালার রূপকথা বলায় বাধা দেয় না। চুপচাপ শুনিয়া যায়। গল্প বলার ফাঁকে ফাঁকে মালাই সকলের সঙ্গে আলাপ করে।

অ লো উলুপী, পাক করছিলি কি?

আখায় দুগা বাইগন দিছিলাম। আর ইলশার ঝোল।

কুকী। গায় কাপড় তুইলা বয় হারামজাদী। মাইয়া য্যান্ সঙ?

বলিয়া আড়চোখে চাহিয়া কুবেরকে লজ্জা দিয়া আবার রূপকথা বলিতে থাকে।

চার

এবার বর্ষায় আউশ ধানের ফসল নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

পীতম মাঝির বাড়ির পিছনে তেঁতুলগাছটার গুঁড়ি পর্যন্ত কোনবার জল আসে না, এবার আউশ ধান পাকিবার সময় হঠাৎ এত জল বাড়িয়া গেল যে গাছের গুঁড়িটা সপ্তাহকাল ডুবিয়া রহিল প্রায় তিন হাত জালের নীচে। এ জল আগে বাড়িলে ক্ষতি ছিল না, জলের সঙ্গে ধানের গাছও বাড়িয়া চলিত। কিন্তু ফসল পাকিবার সময় জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়া ধানগাছ কেমন করিয়া বাড়িবে?

বড় বর্ষা হইয়াছিল এবার। কেতুপুরের মাইল পাঁচেক দূরে চলার চর নামে পদ্মার একটা নীচু চর অনেক জলে ডুবিয়া গিয়াছিল, অনেকে ভয় পাইয়া চলিয়া গিয়াছিল চর ছাড়িয়া। বহুকাল আগে খেয়ালী পদ্মা যে ভূমিখণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছিল কে জানে সে আবার তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিবে কিনা! ডাঙায় গ্রামে বর্ষার জল ঘরে উঠিলেও পূর্ববঙ্গের লোক ভয় পায় না, সে জলের স্রোত নাই। কিন্তু পদ্মার বুকে ছোটখাট চরে যেসব গ্রাম, পদ্মার জল নাগাল পাইলে সেসব গ্রামের ঘরবাড়ি গোরুমানুষ কুটার মত ভাসাইয়া লইয়া যাইবে।

কত গ্রাম যে এবার পাঁচ-সাত দিন জলের নীচে ডুবিয়া ছিল।

মালার বাপের বাড়ির গ্রাম চরডাঙা নাকি তলাইয়া গিয়াছিল এক-কোমর চলের নীচে।

খবর পাইয়া মালা কাঁদিয়া অস্থির হইয়াছিল। বলিয়াছিল, আই গো তোমার পাষাণ প্রাণ। আমার বাপ-ভাই ডুইবা মরে, একবার নি খবর নিলা।

গণেশকে সঙ্গে করিয়া কুবের একদিন খবর আনিতে গেল।

খাল পুকুর মাঠ ঘাট তখন একাকার হইয়া গিয়াছে। দুমাস আগে যে ক্ষেতের আল দিয়া মানুষ চলাচল করিত, এখন সেখানে লগি থই পায় না। কোন গ্রাম ভাসিয়া আছে দ্বীপের মত, কোন গ্রামে মানুষের ঘরের ভিতরে একহাঁটু জল উঠিয়াছে, সকলে বাস করিতেছে মাচা বাঁধিয়া। যে পারিয়াছে গোরু-বাছুরের জন্যেও মাচা বাঁধিয়া দিয়াছে, যে পারে নাই তার বোবা অসহায় পশুগুলি ঠায় দাঁড়াইয়া আছে জলের মধ্যে। গাছের ডালে পাখিয়া আছে শুধু সুখে, ভূচর মানুষ ও পশুর কষ্ট অবর্ণনীয়। এক বাড়িতে কান্না শুনিয়া কুবের উঠানে নৌকা লইয়া গেল, দাওয়ায় খুঁটি ধরিয়া ঘরে চাহিয়া দেখিল কুবের খুঁটির উপর দুখানা তক্তপোষ একত্র করিয়া জিনিসপত্র গৃহস্থ সপরিবারে বাস করিতেছে, মাসখানেকের একটি শিশুকে বুকে করিয়া গৃহস্থের স্ত্রী কাঁদিয়া আকুল। কী হইয়াছে শিশুটির? নীচে পড়িয়া ডুবিয়া মরিলে গিয়াছে কাল রাত্রে। কতটুকু জল মেঝেতে, এক হাতও হইবে না! ছেলেকে বুকে আঁকাড়াইয়া ধরিয়া জননী ঘুমাইয়াছিল, কখন কেমন করিয়া সে নীচে পড়িয়া গিয়াছিল কে জানে! এক মাসের শিশু নিজে তো নড়িতে-চড়িতে পারে না, সেই ভরসায় তক্তপোষের মাচার চারিদিকে বেড়া তাহারা দেয় নাই, দুদিকে স্বামী-স্ত্রী শুইয়াছিল, মাঝখানে ছিল শিশু। ছেলেকে বুকে করিয়া ঘুমের ঘোরে জননী কি পাশ ফিরিয়াছে? ঘুমের ঘোরে ধারে সরিয়া সে-ই কি সন্তানকে বিসর্জন দিয়াছিল সর্বনাশা বন্যার জলে?

চরডাঙা পৌঁছিয়া দেখা গেল সমস্ত গ্রাম জলমগ্ন, কোথাও একহাত একটু শুকনো জমি নাই। ঘরে ঘরে স্রোতহীন কর্দমাক্ত জলরাশি থতমত করিতেছে। কুবেরের শ্বশুরবাড়িতে সকলে আশ্রয় লইয়াছে বড় ঘরের চালার তলে কাঠের ছোট স্থায়ী মাচাটুকুতে।

দুটি গোরু ও বাছুরের জন্য তিনটি সুপারিগাছের মধ্যে মোটা বাঁশের ত্রিকোণ মাচা বাঁধা হইয়াছে; বাড়ীর পোষা কুকুরটিও স্থান পাইয়াছে সেখানে। মালার বুড়া বাপ বৈকুণ্ঠ মাচায় বসিয়া ভীত গোরু দুটিকে খড় দিতেছিল, ঘরের চালে বসিয়া বড়শি দিয়া মাছ ধরিতেছিল মালার বড় ভাই অধর, আর ঘরের ভিতরকার মাচায় উঠিবার মই হইতে এদিকে রান্নাঘরের চাল পর্যন্ত পাশাপাশি দুটি বাঁশ বাঁধিয়া ইহারা যে সাঁকো তৈয়ারী করিয়াছে তাহার উপরে পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিল কয়েকটি উলঙ্গ ছেলেমেয়ে। কুবের আসিয়াছিল শুনিয়া মালার ছোট বোন

কপিলা মই ধরিয়া নামিয়া আসিল। কুবেরের শাশুড়ী আর নামিল না, ঘরের মাচার উপর হইতেই কন্যা ও নাতিনাতনীর কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বর্ষার দেবতাকে শাপান্ত করিতে করিতে বলিতে লাগিল যে এতখানি বয়স তাহার হইয়াছে, এমন প্রলঙ্কর কাণ্ড আর তো সে দেখে নাই বাপের জন্মে। কুবের কি জানে কী সর্বনাশ তাহাদের হইয়া গিয়াছে, বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া পাট পচাইতে দিয়াছিল, অর্ধেক পাট যে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে পাত্তা নাই। ভাসিয়া আর যাইবে কোথায়, কেউ চুরি করিয়াছে নিশ্চয়। হ গরিব গৃহস্থ তাহারা, কত আশায় এবার ধানের জমিতে পর্যন্ত পাটের চাষ দিয়াছিল, কে তাহাদের এমন সর্বনাশ করিয়াছে গো?

মাচা হইতে বৈকুণ্ঠ, চালা হইতে অধর, মই হইতে কপিলা আর সাঁকো হইতে উলঙ্গ ছেলেমেয়েগুলি নৌকায় আসিয়া আরাম করিয়া বসিল। কুবের তামাক সাজিয়া দিল বৈকুণ্ঠকে।

কপিলা বলিল, নাও নিয়া আইলা মাঝি, বইনেরে আনলা না ক্যান। কতকাল দেখি নাই বইনেরে! পোলাপানগো তো আইনবার পারতা?

কুবের বলিল, আনুম ভাবছিলাম। তোমরা এখানে কিবা রইছ না জাইনা শ্যাষম্যাশ ডরাইলাম। আসনের লাইগা গোপী কাইন্দা সারা হইয়াছিল। তুমি আইলা কবে কপিলা?

কপিলা রূঢ়স্বরে বলিল, হাসলা যে মাঝি?

সহসা স্বাভাবিক প্রশ্নে কপিলার বিরক্তি দেখিয়া কুবের একটু অবাক হইয়া বৈকুণ্ঠের দিকে চাহিল। একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ চোখ মটকাইয়া তাহাকে কী যেন ইশারা করিল। কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কুবের করিল কি, মৃদু একটু হাসিয়া বলিল, অ!

কপিলা রূঢ়স্বরে বলিল, হাসলা যে মাঝি?

কুবের বলিল, হাসি নাই কপিলা, হাসুম ক্যান।

কুবেরের বিবাহের সময় বড় দুরন্ত ছিল কপিলা। তখন পঙ্গু মালাকে বিবাহ করিয়াছিল বলিয়াই হয়তো কপিলার দুরন্তপনা অত বেশী চোখে পড়িয়াছিল কুবেরের, অন্ধকারে যে বাস করে মৃদু আলোতে তার চোখ ঝলসাইয়া যায়, চোখ ঝলসানো আলোতে সে হয় অন্ধ। তারপর কপিলার বিবাহ হইয়াছে, একটি মেয়ে হইয়া আঁতুড়ে মরিয়া গিয়াছে বছর দুই আছে। কে জানে কত শান্তশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে কপিলা আজকাল, কেমন সংসারী হইয়াছে তাহার মন? আর কি কোনদিন সে গাছের ডালে কাঁচা বেতের দোলনা বাঁধিয়া দোল খাইবে, কিশোর বয়সের অপূর্ব দেহটিকে ঘাটের উপর হইতে ছুঁড়িয়া দিবে পুকুরের জলে, ডিঙি লইয়া একা পলাইয়া গিয়া সকলকে দিবে বকুনি দেওয়ার শাস্তি? রাগের মাথায় এ জীবনে আর কখনো হয়তো সে কুবেরকে চ্যালাকাঠ ছুঁড়িয়া মারিবে না। না মারুক! একজন চ্যালাকাঠ ছুঁড়িয়া মারিবে না বলিয়া আপসোস করার কী আছে? খানিক পরে পাশাপাশি দুটি বাঁশের উপর দিয়া কপিলাকে ঘরের দিকে যাইতে দেখিয়া কুবেরের দুচোখ ঝাপসা হইয়া আসিল। হ, সেই পুরানো দিনের স্মৃতি গাঁথা হইয়া আছে কুবেরের মনে।

জল কমিয়া যাওয়া পর্যন্ত কেতুপুরে তাহার বাড়িতে গিয়া থাকিবার জন্য কুবের সকলকে নিমন্ত্রণ করিল। এ আহ্বান তুচ্ছ করিবার মত নয়, কিন্তু সকলে গেলে কেমন করিয়া চলে? বাড়িঘর জিনিসপত্র সব সাময়িকভাবে তুলিয়া লইয়া যাইতে পারিলে হইত, সে তো সম্ভব নয়। বোবা গরুবাছুরগুলির কী হইবে। যাইতে পারে ছেলেমেয়েগুলি—আর তাদের দেখাশোনা করিবার জন্য কপিলা যদি যায় তো যাক, মালা তো পারিবে না এতগুলি কাচ্চা-বাচ্চাকে সামলাইতে।

কপিলা যাইবে? বেশ।

কুবেরের শাশুড়ি বড় চেঁচায়। সে বলল, তোমারে কমু কী মাইয়ারে নিয়া জ্বইলা মরি— হ রে বাপ, কপিলার কথা কই— আলার লইগা ভাবুম কেরে? সোনার জামাই তুমি, খোঁড়া মাইয়ারে আমার মাথায় কইরা থুইছ— এই পোড়াকপাইল্যার কথা কই, কই আমাগো কপিলার কথা। অলক্ষ্মীর মরণ নাই!

সে বড় দুঃখের কাহিনী। সুখে ঘরকান্না করিতেছিল কপিলা, কী যে শনি ভর করিল তাহার কপালে, শীতের গোড়ার স্বামীর সঙ্গে কলহ করিয়া সে চলিয়া আসিল বাপের বাড়ি। রাগ করিয়া তাহার স্বামী শ্যামা দাস আবার বিবাহ করিয়াছে, কপিলাকে নেয় না।

এ খবর কুবের জানিত না। সে বিস্ময়ে বলিল, হ।

তারপর কপিলাকে স্বামীর কাছে পাঠানো হইয়াছিল— ফাল্গুন মাসে। শ্যামা দাস তাহাকে বাড়িতে উঠিতে দেয় নাই, খেদাইয়া দিয়াছে। মানুষ তো নয়, পশু। তাই তো কুবেরের সঙ্গে তুলনা করিয়া কপিলার মা দিনরাত্রি তাহাকে গাল দেয়।

তাই বটে, পঙ্গু বলিয়া মালাকে সে কখনো অনাদর করে নাই সত্য। সেটা তবে এতখানি প্রশংসার ব্যাপার? মালার জন্য তাহার জন্য তাহার দারিদ্রপূর্ণ সংসার। ওই অলস অকর্মণ্য রমণীটির জন্য কুবের হঠাৎ নিবিড় স্নেহ অনুভব করে; সৎ গৃহস্থ ও সৎ বলিয়া তাহার জননী গলার জোরে দিগ্‌দিগন্তে রটনা করে তাহা যেন মালারই কীর্তি।

খাওয়া-দাওয়ার পর কপিলা ও তাহার ভাইবোনদের সঙ্গে করিয়া কুবের কেতুপুরের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল। কপিলা খুব সাজিয়াছে। চুলে চপচপে করিয়া দিয়াছে নারিকেল তেল, হলুদ মাখিয়া করিয়াছে স্নান, পরিয়াছে তার বেগুনে রঙের শাড়িখানা। স্বামী ত্যাগ করিয়াছে বটে, বয়েস তো তার কাঁচা। আহা, কুটুমবাড়ি যাওয়ার নামে মেয়েটা আহ্লাদে আটখানা হইয়া উঠিয়াছে।

কেতুপুরে পৌঁছিতে বেলা কাবার আসিল। মালা উতলা হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল, কিছু পাট চুরি-যাওয়া ছাড়া তাহার বাপ ভাইয়ের আর কোন ক্ষতি হয় নাই শুনিয়া সে আশ্বস্ত হইল। মালা শুধু খোঁড়া হইয়া জন্মে নাই, আরও একটি পঙ্গুতা তাহার আছে; সে হাসিতে জানে না, জীবন তাহাকে অলস করিয়া বিষণ্ন করিয়াছে। ভাইবোনদের কাছে পাইয়া কতকাল পরে যে মুখে তাহার বিষণ্নতার ছায়ালেশহীন হাসি ফুটিল।

এদিকে স্বস্তি নাই কুবেরের। তার মত গরীব কে আছে জগতে? এই যে এতগুলি মানুষ আসিল বাড়িতে, ইহাদের সে খাওয়াইবে কী? আউশের ফসল নষ্ট হইয়া এবারে যে দেশে দুর্ভিক্ষ হইবে এন হইতে তাহা টের পাওয়া যায়, জলমগ্ন পৃথিবীতে আহার্যের মূল্য বাড়িয়াছে। ইলিশের মরসুম বলিয়া এখন যদি বা কোন রকমে চলিয়া যায়, তারপর? দু-চার পয়সা জমাইবার আশা ঘুচিয়া গেল। অতিথি আসিয়াছে, অতিথি চলিয়া যাইবে, তারপর সপরিবারে উপবাস করিবে সে। তখন হাত পাতিলে বৈকুণ্ঠ একটি পয়সাও তাহাকে দিবে না।

নিমন্ত্রণ করিয়া ওদের সে তবে আনিয়াছে কেন? তার দুঃখের দিনে যারা ফিরিয়া তাকায় না, কেন সে তাদের অত খাতির করিতে গেল? সে আদর করিয়া ডাকিয়অ না আনিলেও বন্যার ক-টা দিন ওরা মাচার উপর বেশ কাটাইয়া দিতে পারিত। মনে মনে কুবের রাগিয়া যায়। মালা খুশী হইয়াছে। হাসি ফুটিয়াছে মালা মুখে? স্বামীর দুঃখ না বুঝিয়া যে স্ত্রীলোক বাপভাইয়ের জন্য কাঁদিয়া মরে, হাসিমুখে তাহার মুখে গুঁজিয়া দিতে হয় আখার তলের ছাই। মালা উতলা না হইলে কে যাইত চরডাঙায়? কে আনিত তাহার ভাইবোদদের ডাকিয়া?

প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাবেলা কুবের মাছ ধরিতে যাওয়ার আগে, পিসী সকলকে ভাত বাড়িয়া দেয়। কুবের এইমাত্র খাইয়া উঠিয়াছে, তবু তাহার নিজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আরও কয়েকটা প্রাণীকে সারি দিয়া বসিয়া খাইতে দেখিয়া ভবিষ্যতের অনিবার্য ক্ষুধায় তার ভরা পেটের অন্ন যেন মুহূর্তে হজম হইয়া যায়। মালা বসিয়া বসিয়া সকলের খাওয়ার তদ্বির করে, গোপীর পাতের ডালমাখা ভাতটুকু সে আদর করিয়া তাহার ভাইয়ের পাতে তুলিয়া দেয়— এ দৃশ্য কুবের আর দেখিতে পারে না। নৌকায় গিয়া সে বসিয়া থাকে। হয়তো তখন গণেশ ও ধনঞ্জয় কেহই আসে নাই— কুবের চুপ করিয়া বসিয়া থাকে একা। নদীর ঢেউয়ে নৌকা দোল খায়। হু হু করিয়া বহে বাতাস, অন্ধকার এত গাঢ় যে মনে হয় ধোঁয়ার মতই বুঝি বাতাসে উড়িয়া যাইবে।

কপিলা যে পিছু পিছু আসিয়াছে তা কি কুবের জানে?

তাহার আকস্মিক হাসির শব্দে কুবের ভয়ে আধমরা হইয়া যায়। ঠকঠক করিয়া সে কাঁপিতে থাকে। নির্জন নদীতীরে সন্ধ্যারাত্রে কে হাসিবে? মানুষ নয়, নিশ্চয় নয়!

কপিলা বলে, তামুক ফেইল্যা আইছ মাঝি।

কুবের নামিয়া আসিয়া তামাকের দলাটা গ্রহণ করে।

বলে, খাটাসের মত হাসিস ক্যান কপিলা, আঁই?

কপিলা বলে, ডরাইছিলা, হ? আরে পুরুষ!

তারপর বলে, আমারে নিবা মাঝি লগে?

বলে আর কপিলা আব্দার করিয়াঅ কুবেরের হাত ধরিয়া টানাটানি করে, চিরদিনের শান্ত নিরীহ কুবেরকে কোথায় যেন সে লইয়া যাইবে। মালার বোন না কপিলা? হ। কুবের তাহার দুই কাঁধ শক্ত করিয়া ধরিয়া অবাধ্য বাঁশের কঞ্চির মত তাহাকে পিছনে হেলাইয়া ধরে, বজ্জাতি করস যদি, নদীতে চুবান দিমু কপিলা।

কপিলা ধপ করিয়া সেইখানে কাদার উপরে বসিয়া পড়ে, হাসিতে হাসিতে বলে, আরে পুরুষ!

তাহার নির্বিবাদে কাদায় বসা আর শয়তানী হাসি আর খোঁচা দেওয়া পরিহাস—সব বড় রহস্য ও দুর্বোধ্য। হঠাৎ কুবেরের বড় ভয় হয়। সে সস্নেহে বলে, পাক মাইখা মরস কেনে কপিলা? মাইনষে কইব কী? যা বাড়িত যা।

কে জানে কী আছে কপিলার মানে? সে চলিয়া গেলে কুবেরের দুটি চোখের ঔৎসুক্য অন্ধকারে গোপন হইয়া থাকে। কপিলার আনিয়া দেওয়া-তামাক সাজিয়া সে টানিতে আরম্ভ করে। তামাকের ভাগীদার না থাকার আরামটুকুই কি তাহার মানসিক চাঞ্চল্যকে ক্রমে ক্রমে শান্ত করিয়া আনে, অথবা সে নদীর বাতাস—নায়ের দোলনে পদ্মার প্রেম? মালা যে-কোনো দিন ওঠে নাই, হাঁটে নাই, ঘুরিয়া বেড়াইয়া চারিদিকে জীবনকে ছড়াইয়া মেলিয়া রাখিতে পারে নাই, তারজন্য কুবেরের কোনদিন আপসোস ছিল না। গতি নাই বলিয়া মালর আবদ্ধ ঘনীভূত জীবন তারই বুকে উথলিয়া উঠিয়াছে—ভাঙা চালার নীচে সঙ্কীর্ণ শয্যায় পঙ্গু মালার তুলনা জগতে নাই। কিন্তু অন্ধকার রাত্রে তামাক পৌঁছাইয়া দিতে সে তো কোনোদিন নদীতীরে ছুটিয়া আসিতে পারে না—বাঁশের কঞ্চির মত অবাধ্য ভঙ্গিতে পারে না সোজা হইয়া দাঁড়াইতে।

বেগুনী রঙের শাড়িখানি পরিয়া চুল চপচপে তেল দিয়া শুধু লীলাখেলা করিতেই কপিলা পটু নয়, কুবেরের সেবাও সে করে—জীবন কুবের কখনো যে সেবার পরিচয় পায় নাই। সারারাত্রি পদ্মার বুকে কাটাইয়া আসিয়া এখন সে না চাহিতে পা ধোয়ার জল পায়, পান্তা-ভাতের কাঁসিটির জন্য হাঁকাহাঁকি করিতে হয় না, খাইয়া উঠিবামাত্র তামাক আসে, প্রস্তুত থাকে তাহার দীনমলিন শয্যা এবং ফাঁক পাইলেই কোনদিন গোঁফ ধরিয়া টান দিয়া, কোনদিন একটা চিমটি কাটিয়া, হাসি চাপিয়া চোখের পলক উধাও হইয়া—ঘুম আসিবার আগেই কপিলা তাহাকে স্বপ্নও আনিয়া দেয়।

পরের পেট ভরাইতে ফতুর হইতে বসিয়াও গৃহে তাই কুবেরের আকর্ষণ বাড়ে।

কমে মাঠঘাটের জল।

ও তো মানুষের চোখের জল নয়, কমিবে বৈকি। একদিন মালার বড় ভাই অধর লইতে আসে। কুবেরকে সে সত্য-সত্যই কুবের ঠাওরাইয়া রাখিয়াছে কিনা সে-ই জানে, কর্জ চাহে দুটি টাকা। না পাইয়া তাহার রাগ হয়। সকলকে সে চরডাঙায় ফিরাইয়া লইয়া যাইতে চায়। কুবের বারণ করে না, মালাও নয়, ভাইবোনকে কাছে পাওয়ার আনন্দ পুরানো হইয়া আসিতে কতদিন আর লাগে বোনের? তাছাড়া কপিলার চাপল্য ও হাস্যপরিহাসের জন্য ঈর্ষাও হয়তো মালার হয়, কোনদিন হয়তো কুবেরের সঙ্গে কপিলার অন্যায় মখামাখি চোখেও পড়িয়াছে

তাহার— একস্থানে ঠায় বসিয়া থাকিলেও দৃষ্টি তো সে পাতিয়া রাখে সর্বত্র।

কিন্তু কপিলা যায় না। ঝগড়া করিয়া গাল দিয়া অধরকে সে ভাগাইয়া দেয়। সে জানে, কী আছে কপিলার মনে!

ময়নাদ্বীপ হইতে রাসুর আকস্মিক আবির্ভাবের বিস্ময় গ্রামের লোকের কাছে পুরানো হইয়া গিয়াছে, রাসুর অভিজ্ঞতার গল্প শুনিবার কৌতূহল কাহারও নাই। রাসু বলিতে চায়, সবিস্তারে বারবার আগাগোড়া সমস্ত কাহিনিটা বলিবার জন্য সে ছটফট করে, কিন্তু শ্রোতা পায় না। কত শুনিবে লোকে। শুনিয়া শুনিয়া কান ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে সকলের।

হোসেন মিয়া কিছু টাকা দিয়াছে রাসুকে, ইচ্ছা টাকাটা দিয়া সে একটি বৌ খরিদ করে, গোপী হইলেই ভাল হয়। কিন্তু কুবের এ প্রস্তাব কানেও তোলে না। কত টাকা দিয়াছে হোসেন মিয়া তাহাকে? তা ছাড়া গোপীর পাত্র ঠিক হইয়াই আছে— গণেশের শালা যুগল। যুগলের মত পাত্র থাকিতে তার হাতে কুবের মেয়ে দিবে কেন?

গোপীকে কিন্তু বড়ই পছন্দ হইয়াছে রাসুর।

ময়নাদ্বীপের গল্প করিবার ছলে সে কুবেরের বাড়ি আসে, আড়চোখে আড়াচোখে সারাক্ষণ সে গোপীর দিকে তাকায়, পরীর মত সুন্দরী মনে হয় গোপীকে তাহার ভাইকে কোলে করিয়া বাঁকা হইয়া কী তাহার দাঁড়ানো ভঙ্গিমা। হ, রুখো-রুখো লালচে বটে চুলগুলি গোপীর, কপালটা একটু উঁচুই, থ্যাবড়ানো নাকের নীচে উত্তোলিত ওষ্ঠে ঠেকিয়া নোলকটা তাহার দুলিতে পায় না, আর বড় নোংরা গোপী! তবু তো রাসু চোখ ফিরাইতে পারে না! তবু তো তার মনে পরে না এমন অতুলনীয় রূপ সে কোথাও দেখিয়াছে! কী রঙ গোপীর! কী মনোহর তাহার চলাফেরা, কী চাউনি!

বয়স রাসুর বেশী হয় নাই, যুগলের চেয়েও তার বয়স কম। নূতন করিয়া সংসার পাতিয়া জীবনটা আবার গুছাইয়া লইবার সময় তাহার পার হইয়া যায় নাই। গোপীকে পাইলে আবার সে আরম্ভ করিতে পারে,—বয়স্থা বাড়ন্ত মেয়ে গোপী, বিবাহের এক বছরের মধ্যে স্বামীর ঘর করিতে আসিবে, পাঁচ-ছ বছরের একটা মেয়েকে বিবাহ করিয়া তার বড় হইবার আশায় হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিবার ধৈর্য রাসুর আর নাই। যাদের সে বিসর্জন দিয়া আসিয়াছে ময়নাদ্বীপে, তাড়াতাড়ি আবার তাহাদের ফিরিয়া পাওয়া চাই। একা একা বড় কষ্ট হইতেছে রাসুর। পীতম মাঝিরা সঙ্গে রাসুর কলহ হইয়া গিয়াছে। হোসেন মিয়ার দেওয়া টাকাটা বাগাইয়া লওয়ার জন্য মাঝি বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। রাসু তাই পৃথক হইয়া গিয়াছে। কে জানিত গ্রামের মধ্যে পীতমের মেয়ে যুগীই সর্বস্বান্ত পিসতুতো ভাইটিকে এতখানি খাতির করিবে। শীতলকে দিয়া বাবুদের বলিয়া নিজের ঘরের কাছে খানিকটা জমি যুগীই রাসুকে যোগাড় করিয়া দিয়াছে— রাসু একখানা ঘর তুলিয়াছে সেখানে।

সেই ঘরে রাসু বাস করে একা, হয়তো ধ্যান করে গোপীর! বিকালে কেতুপুর গ্রামের মধ্যে সওদা আনিতে যাওয়ার সময় পথের নির্জনতম অংশে কোন কোনদিন গোপী রাসুকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতে পায়।

রাসু বলে, কই যাও গোপী? সে একটু স্নেহ-ব্যঞ্জক হাসি হাসে। গাঁট হইতে বাহির করে একটি কাঁচ-বসানো পিতলের আংটি আর পুঁতির মালা, বলে, নিবা?

গোপী খুশী হইয়া উপহার গ্রহণ করে। রাসুকে ভালই লাগে তাহার, রাসুর জন্য সে-ই একটু দুঃখ বোধ করে। কোথায় সে ময়নাদ্বীপ কে জানে, সকলকে রাসু সেখানে হারাইয়া আসিয়াছে, বড় কষ্ট পাইয়াছে সে জীবনে! তাছাড়া রাসুর কথাগুলি ভারি মিষ্টি, শুনিতে বড় ভাল লাগে গোপীর। আর কী খাতিরটা রাসু তাহাকে করে। কত যেন সে বড় হইয়াছে, এগার বছরের মেয়ে সে নয়।

যুগীর সঙ্গে মাঝে মাঝে রাসু পরামর্শ করে, একটা কি উপায় ঠাওরানো যায় না কুবেরকে যাহাতে রাজী করানো যায়? পরামর্শ অনেক হয়, উপায় হয় না। শীতলের অনুপস্থিতিতে তাহার

পরিষ্কার শয্যায় আরাম করিয়া বসিয়া তাহার হুঁকায় তামাক টানিতে টানিতে পরামর্শ করিতে ভাল লাগে রাসুর। আর যুগীর সমবেদনা। রাসুকে যুগী খুব খাতির-যত্ন করে, রাসুর মুখে ময়নাদ্বীপের কাহিনী বার বার শুনিয়াও সে শ্রান্ত হয় না। কত বাসিন্দা ময়নাদ্বীপে? কী কী ফসল হয়? দ্বীপের চারিদিকে বুঝি সমুদ্র? আচ্ছা সমুদ্র কত বড়— পদ্মার চেয়েও বড় বুঝি? আজও যুগী রাসুকে এইসব প্রশ্ন করিতে ভালবাসে। যুগীর বয়স বেশী নয়, বছর বাইশ— বড় শান্ত তাহার মন। শীতল তাহাকে সুখে রাখিয়াছে জেলেপাড়ার দারিদ্র্য ও হীনতা হইতে। যুগীর মনে অপরিমিত সন্তোষ। এত দয়ামায়া, এমন কোমলতা জেলেপাড়ার আর কোন মেয়ের নাই। জেলেপারার কারো ঘরে। কোনদিন যদি অন্ন না থাকে, চুপি চুপি একবার যুগীর কাছে আসিতে পারিলে আর তাহার উপবাসের ভয় থাকে না।

দুঃখের কাহিনী যে যত জমজমাট করিয়া বলিতে পারে ছলছল চোখে যুগী তাহাকে চাল দেয় বেশী— খরচের পয়সা দান করিয়া শীতলের বকুনি শোনে। শীতল লোকটা বড় কৃপণ, যুগীর দান করা স্বভাবটা সে পছন্দ করে না, কিন্তু এমন আশ্চর্য মন মানুষের, যুগীর এই মন্দ স্বভাবের জন্যই তাহাকে শীতল ভালবাসে বেশী। যুগীকে সে কৃপণ হইতে বলে কিন্তু সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিলে যুগী যেদিন ভয়ে ভয়ে তাহাকে না শোনায় যে একজন আসিয়া তাহার ঘাড় ভাঙিয়া যা পাইয়াছে আদায় করিয়া লইয়া গিয়াছে, যেদিন মনটা যেন খুঁতখুঁত করে শীতলের।

মাছের মূল্য বাবদ কুবের কয়েক আনা পয়সা পাইত। শীতল কখনো ঋণ পরিশোধ করে না। তাদিগ করিয়া করিয়া কুবের হয়রান হইয়া গিয়াছে। তবু একদিন সকালে সে আশা করিয়া আসিল।

যুগী রাঁধিতেছিল, শীতল আর রাসু করিতেছিল গল্প। কুবেরকে দেখিয়া রাসু চঞ্চল হইয়া উঠিল, বসিতে দিয়া খাতির করিয়া কলিকাটা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, তামুক খাও।

না, কুবেরের বসিবার সময় নাই, তামাক খাওয়ার সময় নাই, শীতল তাড়াতাড়ি পয়সাটা দিয়া দিক, সে তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইবে— বসিয়া তামাক টানিতে আসিয়াছে নাকি সে? হ, কুবের আজ রাগিয়াছে। আজ সে মাছের দাম আদায় করিয়া ছাড়িবে। শীতল প্রথমে অমায়িক হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে, এত রাগ কেন কুবেরের, এই সকালবেলা? তারপর সেও রাগিয়া যায়, যা যা দিমু না পয়সা, কর গিয়া নালিশ।

রাসু বুঝি কুবেরকে খুশি করতে চায়, সে বলিল, দেন শেতলবাবু, দিয়া দেন পয়সা।

পয়সা দিল যুগী। কলহের মাঝখানে দশ আনা আনিয়া কুবেরের সামনে রাখিয়া দিল, শীতলকে ধমক দিয়া বলিল, সামান্য ক-আনা পয়সার জন্য এত কাণ্ড করা কী জন্য? কত কর্তৃত্ব যুগীর! শীতল কথাটি বলিল না, কুবেরের দিকে কড়া চোখে চাহিয়া ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল।

পয়সা কুড়াইয়া কুবের উঠিল, সঙ্গে উঠিল রাসু। কী বিনয় রাসুর, কী সব তোষামোদের কথা। পথ চলিতে চলিতে রাসু নানা কথা বলে। এবার সে একটা ব্যবসা আরম্ভ করিবে—ব্যবসা ছাড়া পয়সা নাই মানুষের, একটা দোকান দিবে সে দেবীগঞ্জে। কিসের দোকান এখনো সে তো ঠিক করে নাই, ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা কিছু ঠিক করিয়া লইবে—কুবের কী পরামর্শ দেয়? জীবনে উন্নতি করিবে রাসু, প্রাণপণ করিয়া লাগিলে কী না হয় জগতে? তা ছাড়া পুরুষের ভাগ্যের কথা কে জানে! আজ ফকির—কাল রাজা! কুবের গম্ভীর মুখে সায় দিয়া বলে, হ। ভাবে, ময়নাদ্বীপে দিয়া বড় বড় কথা বলিতে শিখিয়া আসিয়াছে রাসু, চাল দিতে শিখিয়াছে! মাঠের দিকে চাহিলে বোঝা যায় জল কোথায় নামিয়া গিয়াছে, ধানের ফসল কাত হইয়া পড়িয়া আছে। পদ্মা হইতে আজ জোর বাতাস বহিতেছিল, চারিদিকে অসংখ্য পাখির কলরব, শিশিরভেজা ডাঙায় ছড়াইয়া আছে সোনার রোদ। শরৎকাল আসিয়া পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। নদী তীরে কাশের বন এবার সাদা হইয়া উঠিবে। কুবেরের সঙ্গে রাসু তাহার বাড়ি পর্যন্ত আগাইয়া যায়। না, গোপী এখন বাড়ি নাই। কপিলার সঙ্গে সে জল

আনিতে গিয়াছে নদীতে। কুবের রাসুকে বসিতে বলে না, পিসীর নিরিবিলি ঘরখানায় গিয়া ঢোকে ঘুমের জন্য, রাসু আস্তে আস্তে ফিরিয়া যায়। যায় সে নদীর ধারে, গাল সে খায় কপিলার, তারপর হন হন করিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করে কেতুপুর গ্রামের দিকে। না, নদীর ধারে ওভাবে দাঁড়ানো উচিত হয় নাই। কপিলা যদি বলিয়া দেয় কুবেরকে?

পাঁচ

ভাদ্রের পরে আশ্বিন। আশ্বিনের মাঝামাঝি পূজা।

একদিন প্রবল ঝড় হইয়া গেল। কালবৈশাখী কোথায় লাগে। সারাদিন টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টি হইল, সন্ধ্যায় আকাশ ভরিয়া আসিল নিবিড় কালো মেঘ, মাঝরাত্রে শুরু হইল ঝড়। কী সে বেগ বাতাসের আর কী গর্জন! বড় বড় গাছ মড়মড় শব্দে মটকাইয়া গেল, জেলেপাড়ার অর্ধেক কুটিরের চালা খসিয়া আসিল, সমুদ্রের মত বিপুল ঢেউ তুলিয়া পদ্মা আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল তীরে। জেলেপাড়ার বৃদ্ধ ও রমণীরা হাহাকার করিয়া রাত কাটাইল, ছেলেমেয়েরা কেহ ভয়ে নিস্পন্দ হইয়া রহিল, কেহ গুমরাইয়া গুমরাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ইলিশের মরসুম শেষ হইলে মোটা উপার্জনের সুযোগ দুদিন পরে ফুরাইয়া যাইবে, জেলেপাড়ার কোন ঘরে আজ বুঝি সমর্থদেহ পুরুষ নাই, পদ্মার বুকে নৌকা ভাসাইয়া ছড়াইয়া গিয়াছে দূরদূরান্তে। কেহ ফিরিবে প্রভাতে, কেহ ফিরিবে না। ঝড় শুরু হইলে ঘরে ঘরে মেয়েরা কপাল কুটিয়া মধুসূদনকে ডাকিয়াছে। এ কি রোষ দেবতার? কেন এ প্রলয়।

সকালে ঝড় কমিল কিন্তু একেবারে থামিল না। সাঁ সাঁ শব্দে বাতাস বহিতে লাগিল, বৃষ্টি পড়িতে লাগিল গুঁড়িগুঁড়ি। জেলেপাড়ার দিকে তাকানো যায় না, ঘন-সন্নিবিষ্ট কুটিরগুলিকে কে যেন আবর্জনার মত নাড়িয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছে। কোন ঘর কাত হইয়া পড়িয়াছে, কোন ঘরে চালা নাই, কোন চালার অর্ধেক খড় উড়িয়া গিয়া বাঁশ বাহির হইয়া পড়িয়ছে, উঠান ভরিয়া গিয়াছে, গোপী খুব আঘাত পাইয়াছে, কে জানে ডান পা-টি তাহার ভাঙিয়া গিয়াছে কিনা। চালা উড়িয়া দূরে গিয়া পড়িয়াছে পীতমের গোয়ালঘরের উপর, হীরু আর সিধুর একখানা ঘরও দাঁড়াইয়া নাই, অনুকূলের তিনখানা ঘরের একটার চালা নাই, বাকি দুইখানার চালায় নাই খড়। রাসুর ঘরখানা ছিল একেবারে ফাঁকায়, ভিটা আর দুটি খুঁটি ছাড়া ঘরের চিহ্নটুকুও দেখিতে পাওয়া যায় না। শীতলের বাড়ির চারিদিকে বড় বড় গাছ, তার একটা গাছ পড়িলে বাড়ি তাহার পিষিয়া যাইত, কিন্তু গাছের আশ্রয়েই ঘরগুলি তাহার বাঁচিয়া গিয়াছে। জেলেপাড়ার আরও অনেকেরই ক্ষতি হইয়াছে অল্পবিস্তর। মুসলমান মাঝিদের মধ্যে ক্ষতি হইয়াছে আমিনুদ্দিন বেশী। প্রকাণ্ড একটা সিঁদুরে আমের গাছ গোড়াসুদ্ধ উপড়াইয়া যে ঘরে আমিনুদ্দিনর বৌ আর ছেলেমেয়ে তিনটি ছিল সেই ঘরখানাকে মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছে। আমিনুদ্দির বৌ থেতলাইয়া মরিয়াছিল সঙ্গে সঙ্গে, সকালে টানিয়া বাহির করার সময় ছেলেটার প্রাণ ছিল, ঘন্টাখানেক পরে সেও শেষ গিয়াছে। শুধু মেয়েটার কিছু হয় নাই। আমিনুদ্দিন কোথায় আছে কে জানে, হয়তো ডাঙ্গায় নয়তো পদ্মার উত্তাল জল তলে, তাহার অতবড় মেয়েটা কারো সান্ত্বনা মানিতেছে না, হাউমাউ করিয়া লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতেছে। যে মেয়ের পর্দা রাখিবার জন্য গরিব আমিনুদ্দি কুটির ঘেরিয়া উঁচু বেড়া দিয়েছিল, আজ যার খুশি তাকে দেখিয়া যাও। কালো চোখে কাল সে যে কাজল দিয়াছিল এখনো তা ধুইয়া যায় নাই—বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে ওর কাজল চোখের সলাজ চাহনি দেখিয়া কল অপরাহ্নে জহরের জোয়ান ছেলে নাসির বুঝি খুশি হইয়া পদ্মায় নৌকা ভাসাইয়াছিল, পদ্মা হয়তো তাকে এতক্ষণ ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে পৃথিবীর বুক হইতে।

ভীত বিবর্ণ মুখে কাঁদিতে কাঁদিতে জেলেপাড়ার নরনারী পদ্মাতীরে গিয়া দাঁড়ায়, আরক্ত চোখে চাহিয়া থাকে উন্মত্ত জলরাশির দিকে। ঘাটে তিনটি নৌকা বাঁধা ছিল, একটি অদৃশ্য

হইয়াছে, দুটি উঠিয়া আসিয়াছে ডাঙায়। খানিক দূরে গাছপালা সমেত খানিকটা ডাঙা ধ্বসিয়া গিয়াছে, আরও খানিকটা অংশ ফাটল ধরিয়া আছে, শীঘ্রই ধ্বসিবে।

পদ্মাতীরে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কোন লাভ নেই, চাহিয়া চাহিয়া চোখ ফাটিয়া গেলেও কাল যারা নদীতে পাড়ি দিয়াছিল তাদের দেখিতে পাওয়া যাইবে না। যে নদীতে ডুবিয়াছে, সে তো গিয়াছেই, ডাঙায় যারা আশ্রয় পাইয়াছে পদ্মা শান্ত না হইলে তাদেরও ফিরিয়া আসা সম্ভব নয়। ডাঙা-পথে আসিতে পারে।

কিন্তু এখনো মাঠে-ঘাটে জল একেবারে সরিয়া যায় নাই, কে কোথায় ডাঙা পাইয়াছে কে জানে, হয়তো সেখান হইতে ডাঙায় পায়ে হাঁটিয়া আসিবার সুবিধা নাই। গৃহের জন্য মন হয়তো তাদের উতলা হইয়াছে, ভোরের আলো ফুটিলে এই উম্মাদিনী নদীর তীর ঘেঁষিয়া নৌকা বাহিয়া হয়তো তাহারা গ্রামে ফিরিবার চেষ্টা করিবে।

বেলা বাড়িয়া উঠিলে ধীরে ধীরে বাতাস পড়িয়া গেল। পদ্মা শান্ত হইয়া আসিল। অপরাহ্নে একটি দুটি করিয়া জেলেপাড়ার নৌকাগুলি ফিরিয়া আসেতে লাগিল। প্রথমে যারা আসিয়া পড়িল, সকলে তাদের ফিরিয়া জুড়িয়া দিল কলরব।—বাকি সব? অন্য সকলের খবর কি?

সকলের খবর তাহারা দিতে পারিল না, কে কোথায় তীরে ভিড়িয়াছে কে জানে, দু-চার জনের খবর মাত্র তাহারা বলিতে পারিল। যাদের সংবাদ জানা গেল তাদের উদ্বিগ্ন আত্মীয়-স্বজনের মুখ হইতে একটা কালো পর্দা যেন সরিয়া গেল। খবর যাদের মিলিল না তাদের আপনজনেরা আবার নীরবে পদ্মার সীমাহীন বুকে দৃষ্টি পাতিয়া রাখিল। তবে প্রত্যেকটি নৌকাই এই একটি আশার বারতা বহিয়া আনিতে লাগিল যে কারও প্রাণহানি হইয়াছে এ সংবাদ তাহারা শুনিয়া আসে নাই। বুক বাঁধিয়া সকলেই প্রতীক্ষা করিতে পারে, হয়তো ব্যর্থ হইবে না।

আমিনুদ্দি ও নাসির একসঙ্গেই ফিরিয়া আসিল। আমিনুদ্দিন জন্য কেহ ঘাটে আসে নাই। জহর আসিয়াছিল, নাসিরকে দেখিয়া সে শুধু বলিল, বাপজান, ফিরা্য আলি রে?—বলিয়া আমিনুদ্দির দিকে চাহিয়অ একেবারে চুপ করিয়া গেল। কারো মুখে কথা নাই। আমিনুদ্দিকে দেখিয়া সকলে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।

আমিনুদ্দি এদিক ওদিক চাহিল, তারপর ভীত উৎসুক কণ্ঠে জহরকে জিজ্ঞাসা করিল, খপর কও মিয়াবাই, ভালা নি আছে বেবাকে? চুপ মাইরা রইলা কেরে আঁই?

কারো কিছু বলিবার ছিল না। হাত ধরিয়া জহর তাহাকে ধীরে ধীরে গ্রামের দিকে টানিয়া লইয়া গেল।

তারপর আসিল কুবের ও গণেশ। আসিল তাহারা অনুকূলের নৌকায়, ধনঞ্জয়ের নৌকাটি ডুবিয়া গিয়াছে। বোকা গণেশের একটি পা মচকাইয়া গিয়াছিল, ঝড়ে নয়, পা পিছলাইয়া একটা সে আছাড় খাইয়াছিল ডাঙায়। উলুপী আজ সারাদিন একরকম পদ্মাতীরেই কাটাইয়াছে, গণেশকে ধরিয়া সেই বাড়ি লইয়া গেল। কুবেরেব জন্য কেহ আসে নাই। পরের মুখে সে তাহার গৃহের বৃত্তান্ত শুনিল। বড় ঘরটা পড়িয়া গিয়াছে? যে ঘর ছাইবার জন্য হোসেন মিয়া শণ দিয়াছিল? গোপীর পায়ে চোট লাগিয়াছে? বিবর্ণ মুখে কুবের বাড়ির দিকে পা বাড়াইল। ঘরদুয়ার অনেকেরই পড়িয়াছে, সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে আমিনুদ্দির, কিন্তু তাহার নিজের ঘরখানা পড়িয়া যাওয়ার চেয়ে বড় দুঃসংবাদ কুবেরের কাছে আর কিছুই নয়। কবে আবার সে ঘর তুলিতে পারিবে কে জানে। মাথা গুঁজিবে কোথায়?

পথে দেখা হইল কপিলার সঙ্গে। কুবেরকে দেখিয়াই কপিলা উচ্চরবে কাঁদিয়া উঠিল, বড় উচ্ছ্বাস কপিলার। বলিল, ফিরা আইছ মাঝি? মুখ রাখছেন—ঠাহুর আমার মুখ রাখছেন, আমি না মানত কইরা থুইছি, পাঁচ পহার হরিলুট দিমু।

কুবের বিব্রত হইয়া বলিল, কাঁদ ক্যান?

সঙ্গে চলিতে চলিতে কপিলা আত্মসম্বরণ করিল।

পায় বিষম চোট পাইছে মাইয়া। শুনছ বিত্তান্ত?

কুবের মাথা হেলাইয়া বলিল, হ। ফুইলা গেছে না?

বিষম ফুলছে। দিনডা ভইরা চিল্লাইয়া মরছে মাইয়া।

চারিদিকে ভাঙা গাছ, ভাঙা ঘর, পত্রপল্লবে আচ্ছাদিত পথ, কুবেরের চোখে জল আসে। ঘরের কাছে গিয়া সে দাঁড়াইল। ঘর কই কুবেরের! ভাঙিয়া অঙ্গনে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছে। পিসীর ঘরে সকলে আশ্রয় লইয়াছিল। ঘরে ঢুকিয়া কুবের ঢেঁকিটার উপর বসিয়া পড়িল। গোপী শুইয়া কাতরাইতেছে। পায়ে তাহার চুন-হলুদ মাখানো হইয়াছে, হাঁটুর কাছে বেজায় ফুলিয়াছে। মালার চোখের ভীত-বিহ্বল দৃষ্টি। গতরাত্রের প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড ভীরু পঙ্গু নারীটিকে আধমরা করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, এখনো সে সামলাইয়া উঠিতে পারে না। কুবের আসিয়া পড়াতে সে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

পিসী ভাত রাঁধিয়া রাখিয়াছিল। ঝড়বাদল ভূমিকম্প কিছুই পিসীর ভাত রাঁধা বন্ধ করিতে পারে না। খানিক পরে উঠিয়া কুবের ভাত খাইল। তারপর গোপীর কাছে একটু বসিল। যন্ত্রণায় মেয়েটার মুখ নীল হইয়া গিয়াছে। কী করিবে কুবের, যন্ত্রণা লাঘবের কী মন্ত্র সে জানে গোপীকে যাতে এতটুকু আরাম দিতে পারে! নীরবে চাহিয়া দেখা ছাড়া কোন উপায় নাই। মালা ধীরে ধীরে বলিতে থাকে, মড়মড় করিয়া ঘর ভাঙিয়া পড়ার সময় আতঙ্কে দিশেহারা হইয়া ছুটিয়া বাহিরে যাওয়ায় কী ভাবে গোপীর উপর চালটা আসিয়া পড়িয়াছিল। ঘরে থাকিলে মেয়েটার কিছু হইত না। ঝড়ের সময় যে বাহিরে যাইতে নাই, ঘরের মধ্যে থাকাই সবচেয়ে নিরাপদ, সেটুকু বুদ্ধি তো মেয়ের নাই। শুনিতে শুনিতে কুবের ঢুকিতে থাকে।

হ, কুবেরের ঘুম পাইয়াছে। উন্মুক্ত নদীতীরে বসিয়া সে কাটাইয়াছে ঝড়ের রাত্রি, সকালে হাঁটিয়া আসিয়াছে দেবীগঞ্জে, দুটি মুড়ি শুধু সে খাইয়াছে, বাড়ি পৌঁছানো পর্যন্ত দুর্ভাবনায় টিপ্‌টিপ্ করিয়াছে বুকের মধ্যে। এখন পেট ভরিয়া খাইয়া আর তাহার জাগিয়া থাকিবার ক্ষমতা নাই। মালার সব তার কানে যায় নাই। গোপীর মাথার কাছে সঙ্কীর্ণ স্থানটুকুতে কোনমতে কাত হইয়া সে এক সময় ঘুমাইয়া পড়ে।

সন্ধ্যার আগে জেলেপাড়ার সকলেই ফিরিয়া আসিল। পদ্মার গ্রাসে কেহ যায় নাই। পীতম মাঝির নৌকাটি শুধু মাছ-নদীতে ঝড়ের মুখে পড়িয়া ডুবিয়া গিয়াছে। নৌকায় ছিল পীতমের ছেলে মাখন, কুবেরের প্রতিবেশী সিধু আর তার ভাই মুরারি— অর্ধমৃত বস্থায় একটা চরে উঠিয়া রাত কাটাইয়া তাহারা ফিরিয়া আসিয়াছে, আর বলিয়া বেড়াইতেছে তাহাদের বাহাদুরির কাহিনী, পাহাড় সমান ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করিয়া কী ভাবে তাহারা নিজেদের প্রাণ বাঁচাইয়াছিল।

কয়েকটা দিন বড় গোলমালের মধ্যে কাটিয়া গেল। ধীরে ধীরে ভাঙা ঘরগুলি সংস্কারের চেষ্টা চলিতে লাগিল। কেতুপুরের দু-চারখানা ঘরবাড়ি পড়িয়া গিয়াছিল, একদিন মেজকর্তা অনন্ত তালুকদারের সভাপতিত্বে গ্রামবাসীদের এক সভা হইয়া গেল। ক্ষতিগ্রস্থ আর দুঃস্থদের জন্য চাঁদা তোলার ব্যবস্থা হইল। অনন্তবাবু নিজে দান করিলেন দশ টাকা, গ্রাম হইতে আরও পনের টাকা উঠিল। তার মধ্যে সাত টাকা দেওয়া হইল কেতুপুরের নন্দ ভট্টাচার্যকে; আহা, ব্রাহ্মণের দু'খানা ঘর পড়িয়া গিয়াছে! জেলেপাড়ার জন্য দেওয়া হইল দশ টাকা— দু-টাকা করিয়া পাঁচজনকে। বাকি টাকাটা বোধ হয় ফাণ্ডে জমা রহিল।

সুখের বিষয় দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর এই সময় হোসেন মিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিল। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে চারিদিকে অবস্থা দেখিয়া বেড়াইল, তারপর দাড়ি নাড়িয়া বলিল, না, টাকা কর্জ দিমু না, ছণ দিমু, বাঁশ দিমু, নিজে খাড়াইয়া তোমাগো ঘর তুইল্যা দিমু—শ্যাষে নিকাশ নিয়া খত লিখুম, একটা কইরা টিপ দিবা।

তাই সই।

পুরাতন জীর্ণ ঘরের বদলে যদি নূতন ঘর ওঠে, খত লিখিয়া দিতে আর আপত্তি কি? ঘর যাহাদের পড়িয়া গিয়াছিল, তাহারা সকলে খুশি হইয়া উঠিল। যাহাদের ঘর পড়ে নাই তাহারা দুঃখিত হইয়া ভাবিল, ঘরদুয়ার তাহাদেরও পড়িয়া গেলে মন্দ হইত না।

সকলেই সাগ্রহে হোসেন মিয়ার সাহায্য গ্রহণ করিল, করিল না শুধু আমিনুদ্দি। সে মাথা নাড়িয়া বলিল, না মিয়া ঘর দিয়া কাম নাই।

আমগাছের তলে তাহার ঘরখানা যেমন নিষ্পেষিত হইয়া পড়িয়া ছিল তেমনিভাবে পড়িয়া রহিল। সত্যিই তো ঘর দিয়া আমিনুদ্দি কী করিবে? কে আছে আমিনুদ্দির? কার জন্য আবার সে দুঃখের দারিদ্রের নীড় বাঁধিবে? জেলেপাড়ার সকলেই আবার পদ্মার বুকের নৌকা ভাসাইয়াছে, আমিনুদ্দি কোথাও যায় না, কার জন্য পদ্মার অতল জলে সে জীবিকার সন্ধান করিবে? শুধু মেয়েটা আছে,— যমীন। কেন আছে কে জানে! সারাদিন যমীন মৃদুস্বরে কাঁদে, আমিনুদ্দি চাহিয়াও দেখে না, না ডাকে কাছে না বলে মেয়ের সঙ্গে কথা।

ক্রমে ক্রমে সকলের নূতন খুঁটি নূতন বেড়া নূতন চালার ঘরগুলি সমাপ্ত হইল। হোসেন মিয়া মজুরদের কী ইঙ্গিত দিয়াছিল সে-ই জানে, কুবেরের ঘরটা উঠিল সকলের আগে। ঘর দেখিয়া হোসেন মিয়া গোপীর জন্য বড় দরদ দেখাইল। বলিল, হাসপাতালে নিয়া যাও কুবির বাই, জবর চোট পাইছে মালুম হয়।

তারপর একখানা খত বাহির করিয়া বলিল, টিপসই দেও কুবির—একুশ টাকা দশ আনার খত লিখিছি—বাদ দিছি দুই টাকা। টিপসই দিয়া রাখ, যখন পরিবা দিবা,— না দিলি মামলা করুম না বাই।— হোসেন মিয়া মৃদু মৃদু হাসিল, জান দিয়া তোমাগো দরদ করি, খত কিসির? লিখা থুইলাম, হিসাব থাকব—না-ত কিসির কাম খত দিয়া?

কুবের বলিল, পুরান বাঁশ, পুরান বেড়া দিলি খরচ কম হইত মিয়াবাই।

ক্যান? পুরান বাঁশ দিয়া ক্যান? খরচার লাইগা ভাইব না, খরচ তো দিছি আমি। না, দিই নাই?

হ' মিয়াবাই দিছেন, আপনেই দিছেন।

টিপসই দিয়া কুবের হোসেন মুখের দিকে চাহিল। বড় ভয় করে কুবের হোসেনস মিয়াকে, বড় টান তাহার হোসেন মিয়ার দিকে। কী যাদুমন্ত্রে তাহাকে বশ করিয়াছে লোকটা?

গোপীর পায়ের ব্যথাও কমে না, ফোলাও কমে না। মেয়েটাকে নিয়া মহা মুশকিলে পড়িয়াছে কুবের। মালার মত গোপীও কি শেষ পর্যন্ত খোঁড়া হইয়া যাইবে? কী ব্যবস্থা করা দরকার কুবের বুঝিয়া উঠিতে পারে না। হোসেন মিয়ার কথামত সদরের হাসপাতালে লইয়া যাইবে নাকি? সে তো কম হাঙ্গামার ব্যাপার নয়। অতখানি পথ গোপীকে কেমন করিয়া লইয়া যাইবে? ব্যথায় সে বিছানাতেই পাশ ফিরিতে পারে না, অত নাড়াচাড়া তাহার সহিবে কেন? অথচ পায়ের যা অবস্থা গোপীর শীঘ্রই কোন ব্যবস্থা না করিলে নয়।

ইতিমধ্যে পূজা আসিয়া পড়িল। চরডাঙা হইতে একদিন আবার আবির্ভাব ঘটিল অধরের। আবার সে রাগারাগি করিয়া সকলকে লইয়া যাইতে চাহিল। ছেলেমেয়েগুলি তার সঙ্গে ফিরিয়া গের চরডাঙায়, কপিলা গেল না। বলিল, কেন, ঘর পড়িয়া গেলে ঢেঁকিঘরটাতে যখন তাহারা সকলে একসঙ্গে মাথা গুঁজিয়া ছিল, অসুবিধার অন্ত ছিল না, তখন অধর আসিতে পারে নাই? এখন নূতন ঘর উঠিয়াছে থাকিবার কোন অসুবিধা নাই, এখন সে যাইবে কেন এদের এই বিপদের মধ্যে ফেলিয়া? কুবেরও ইহাতে সায় দিয়া বলিল, হু, কেন যাইবে কপিলা তাদের এই বিপদের সময়? কপিলা সত্যই প্রাণ দিয়া সকলের সেবা করিতেছিল, বড় কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিল কুবের তাহার কাছে। বড় ভাল মেয়ে কপিলা। কেন যে ওর বোকা স্বামীটা ওকে ত্যাগ করিয়াছে!

কেতুপুরে চারদিন পূজার ঢাক-ঢোল বাজিল—উৎসব হইল। জেলেপাড়ার ছেলেবুড়ো দুবেলা ঠাকুর দেখিল, কেহ কেহ তাড়ি গিলিয়া খুব মাতলামি করিল, শীতল একদিন একটা দেশী মদের বোতল সাবাড় করিয়া রাসুকে ধরিয়া আচ্ছা করিয়া পিটাইয়া দিল। রাসুর উপর তাহার এত রাগ কেন, কে জানে!

সবার সঙ্গে কপিলা একদিন সন্ধ্যার সময় ঠাকুর দেখিতে গিয়াছে খানিক পরে কুবেরও গুটিগুটি গিয়া হাজির। গিয়া দেখে শীতলের সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া কথা বলিতেছে কপিলা।

বাবুদের কর্মচারী শীতল, পূজাও বাবুদেরই ... ভাবখানা দেখ শীতলের, সে-ই যেন সর্বেসর্বা এখানে। ওর সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া এত কথা কিসের কপিলার? তারপর শীতল, প্রসাদ চাহিয়া আনিয়া কপিলার আঁচলে বাঁধিয়া দেয়, কপিলা একগাল হাসে। এত লোকের মধ্যে কপিলার ওই নির্লজ্জ আচরণে রাগে কুবেরের নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে। সে ডাকিয়া বলে, লখা! চল, বাড়িত যাই।

কপিলা বলে, মাঝি আইছ নাকি? খাড়াও মাঝি, আমি যামু, মারে পেলাম কইরা লই।

কুবের বলে, লখা আইলি রে হারামজাদা পোলা?

কপিলা প্রণাম শেষ করিতে করিতে লখাকে সঙ্গে করিয়া কুবের জোরে জোরে হাঁটিতে আরম্ভ করিল। একটু পথ গিয়াই গতি তাহার হইয়া আসিল মন্থরানা, কপিলার জন্য ফিরিয়া সে যাইবে না, তবে আস্তে আস্তে হাঁটিতে দোষ নাই। কপিলা আসিয়া সঙ্গ নেয় তো নিক, অন্ধকার হইয়াছে। কপিলাকে একা ফেলিয়া যাওয়া ঠিক কর্তব্য হইবে না। হয়তো শীতলকেই সে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিতে বলিবে। এতখানি অন্ধকার রাস্তা শীতলের সঙ্গে হাঁটিয়া চলিবে কপিলা? তার চেয়ে বিড়ি কিনিবার ছলে এখানে কুবেরের দাঁড়ানোই ভালো।

বিড়ি কিনিতে কিনিতে কপিলা আসিয়া পড়িল। কুবের কথাটি বলিল না। তিনজনে নীরবে চলিতে লাগিল বাড়ির দিকে। কপিলা আড়চোখে কুবেরের দিকে তাকায়, কিছু ঠাহর হয় না অন্ধকারে। চলিতে চলিতে দেখা হয় রাসুর সঙ্গে, যুগীকে লইয়া ঠাকুর দেখিতে যাইতেছে।

কপিলা যুগীকে বলে, বইন, এক কাম করবা? আমাগো লখারে লইয়া যাও।

কুবের আপত্তি করিয়া বলে, ক্যান ঠাকুর দেখে নাই লখা?

কপিলা বলিল, পোলাপান, সাধ নি মেটে দেইখা? তোমার লখা বুড়া ত হয় নাই মাঝি, এক লজর দেইখা ফাল দিয়া বাড়িত ফিরব? যা রে লখা যুগী মাসির লগে—দেইখো বইন পোলারে, পোলা বড় বজ্জাত।

মতলব কি কপিলার? লখাকে সরাইয়া দিল কেন? কিছুই যেন বুঝিতে পারা যায় না। কপিলা নীরবে পথ চলে, কুবের মনে মনে রাগিতে থাকে। শেষে একটা তেতুঁলগাছের তলে, পথের যেখানে দুর্ভেদ্য অন্ধকার রচিত হইয়াছে সেখানে, হঠাৎ কুবের শক্ত করিয়া কপিলার আঁচল চাপিয়া ধরিয়া বলে, শীতলের লগে অত কথা কিসের তর, আঁই?

কপিলা বলে, কী কর মাঝি? খুইলা পড়ব যে পেরসাদ? আঁচলটা কপিলা টানিয়া ছাড়াইতে চেষ্টা করে, মিনতি করিয়া বলে, পোলাপানের লাগন কইর না মাঝি, ছাড়—রাস্তার মদ্যি ইডা কেমনতর কাণ্ড জুড়লা?

বলিতে বলিতে আর কপিলা আঁচল টানাটানি করে না, কুবের তাহাকে জড়াইয়া ধরিলে শান্ত হইতে থাকে, হঠাৎ বড় যেন করুণ কণ্ঠে বলে, মনডা ভাল না মাঝি, ছাড়বা না? মনডা কাতর বড়।

কুবের তাহাকে ছাড়িয়া দেয়।

চলিতে চলিতে জিজ্ঞাস করে, মন কাতর ক্যান রে কপিলা?

কে জানিত কপিলা এমন উত্তর দিবে!

সোয়ামীরে মনের পড়ে মাঝি।

হ? আগাগোড়া সব তাহা হইলে ফাঁকি কপিলার, সব ছল, এতক্ষণ রসিকতা করিতেছিল কুবেরের সঙ্গে! ভাল কুবেরও রসিকতা জানে। কপিলার গালটা সে টিপিয়া দেয়, হি হি করিয়া হাসে, বলে, তাই ক কপিলা তাই ক! যে সোয়ামী দুর কইরা খেদাইয়া দিছে তার লাইগা মনডা পোড়ায় তর! গেলেই পারস সোয়ামীর ঘর?

যামু।

বলিয়া কপিলা হনহন করিয়া হাঁটিয়া আরম্ভ করে।

ছয়

সেদিন রাত্রে গোপীর পায়ের যন্ত্রণা খুব বাড়িয়া গেল। তাহাকে নূতন ঘরে আনা হইয়াছিল, সারারাত সে ছটফট করিয়া গোঙাইয়া কাটাইয়া দিল। মালা জাগিয়া বসিয়া রহিল তাহার শিয়রে। কুবেরও অনেক রাত অবধি জাগিয়া রহিল। তারপর সে ঘুমাইয়া পড়িল বটে কিন্তু ভাল ঘুম হইল না। শেষরাত্রে উঠিয়া বসিয়া সে ডাকিল, গোপীর মা?

জবাব দিল কপিলা—গোপীর মা ঘুমায়।

কুবের উঠিয়া আসিয়া বলিল, যা তুই ঘুমা গা কপিলা, আমি বইয়া থাকি।

কপিলা চাপা গলায় বলিল, আরে পুরুষ! রাত ভইরা ঘুমাইয়া বিয়ানে কয়, যা তুই ঘুমা গা কপিলা। কাউয়ায় ডাক পাড়ে শুনছ মাঝি?

তাইতো বটে! ফরসা হইয়া আসিয়াছে যে!

ঝাঁপ খুলিয়া কুবের বাহিরে গেল। গণেশের বাড়ি গিয়া ডাকাডাকি করিয়া তুলিল গণেশকে। যুগল কাল বোনের নেমতন্ন খাইতে আসিয়া রাত্রে এখানেই ঘুমাইয়াছিল, সেও উঠিয়া আসিল। কুবের বলিল, গণেশ, মাইয়ারে ত হাসপাতালে নেওন লাগে, বড় কাতর মাইয়া, রাইত ভইরা চেঁচাইয়া মরছে।

গণেশ বলিল, হ।—ব কুবির, তামুক খা। হাসপাতালে নেওন ত সহজ কথা ন! কিবা নিবি ভাবছিস নি?

নাও নিয়া যামু আবার কিবা?

সমস্যার সমাধানে গণেশ খুশি হইয়া বলিল, তবে চিন্তা নাই, যুগইলার নাওখান মিলব আইজ, নাও নিয়া আইছে যুগইলা।—নাওখান দিবি না যুগইলা তর?

যুগল সাগ্রহে নৌকা দিতে সম্মত হইল। বলিল, সেও সঙ্গে যাইবে। খুব বুঝি ফুলিয়াছে গোপীর পা। কোথায় চোট লাগিয়াছে? আগে কেন মেয়েকে হাসপাতালে নেয় নাই কুবের—আগেই লইয়া যাওয়া উচিত ছিল। যাই হোক, আজ যদি হাসপাতালে লইতে হয় দেরি করিয়া লাভ কী? বেলা হইয়া গেলে হাসপাতালে ডাক্তারকে পাওয়া যাইবে না।

একটা চওড়া কাঠের তক্তায় শোয়াইয়া ধরাধরি করিয়া গোপীকে নদীতীরে লইয়া যাওয়া হইল। কাঁথা বালিশ হাতে করিয়া কপিলা গেল সঙ্গে। ইতিমধ্যে জেলেপাড়ায় খবর রটিয়া গিয়াছিল। গ্রামের একটি মেয়েকে হাসপাতালে নেওয়া প্রতিমা বিসর্জনের চেয়ে কম গুরুতর ব্যাপার নয় জেলেপাড়াবাসীদের কাছে—এই ভোরে নদীতীরে একটি ছোটখাট ভিড় জমিয়া গিয়াছিল। প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে কুবের একেবারে হয়রান।

কপিলা আগে নৌকায় উঠিয়া কাঁথাপত্র বিছাইয়া দিল, তারপর গোপীকে তুলিয়া শোয়ানো হইল। যন্ত্রণায় ও ভয়ে গোপীর মুখখানা ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে। হাসপাতাল? না জানি কী ভয়ঙ্কর সেই স্থান! কে জানে সেখানে কী কইবে তাহার! কপিলার একটা হাত গোপী সবলে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিল।

নৌকা খোলা হইবে এমন সময় দেখা গেল রাসু ছুটিয়া আসিতেছে। নদীতীরে পৌঁছিয়া সে লাফাইয়া নৌকায় উঠিয়া পড়িল।

কুবের জিজ্ঞাসা করিল, কিরে রাসু?

রাসু হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, আমিও যামু।

চলুক! এতবড় নৌকা, স্থানাভাব হইবে না। বেশী লোক সঙ্গে থাকিলে গোপীকে উঠানো-নামানোর বরং সুবিধাই হইবে।

মহকুমা শহর আমিনবাড়ি, সেইখানে সরকারী হাসপাতাল। কেতুপুর হইতে আমিনবাড়ি বেশী দূর নয়, ঘণ্টা তিনেক লাগিল পৌঁছিতে। রাসুর সাধ ছিল গোপীকে ঘাট হইতে হাসপাতাল পর্যন্ত লইয়া যাইতে সে-ও কাঁধ দিবে। তার প্রয়োজন হইল না। সকলকে নৌকায় বসিয়া থাকিতে বলিয়া যুগল নামিয়া গেল, খানিক পরে কোথা হইতে খুঁজিয়া পাতিয়া লইয়া

আসিল একটা পালকি। যুগল কি কম পাকা লোক! পালকি চাপিয়া গোপী হাসপাতালে গেল।

হাসপাতালে তখন রোগীর ভিড় জমিয়াছে। একটা ছোট ছেলের ফোড়া অপারেশন করা হইতেছিল, কী তাহার তীব্র চিৎকার। গোপী তো দেখিয়া শুনিয়া বিবর্ণ হইয়া গোঙাইতে আরম্ভ করিল। কুবেরের মুখখানা শুকাইয়া পাংশু হইয়া গিয়াছে। সকলেই অল্পবিস্তর ভীত ও সন্ত্রস্ত। শুধু অবিচলিত আছে রাসু। ময়নাদ্বীপ হইতে পালাইয়া আসিয়া নোয়াখালীর হাসপাতালে সে পনের দিন কাটাইয়া দিয়াছিল, এ তাহার পরিচিত স্থান। সকলকে সে অভয় দিয়া বলিতে লাগিল, ভয় নাই, সব ঠিক হইয়া যাইবে।

সে-ই গিয়া ডাক্তারকে গোপীর অবস্থা বলিয়া নামধাম লিখাইয়া আসিল। কী গর্ব রাসুর। দেখুক কুবের, কেমন চটপট পাকা লোক সে! দেখিয়া রাসুক।

বেলা প্রায় এগারোটার সময় অবসর করিয়া ডাক্তারবাবু গোপীর পা পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষা করিয়া রাগের সীমা রহিল না ডাক্তারের। রাসুই কিনা বুক ঠুকিয়া কথা বলিতেছিল, তাহাকে গোপীর অভিভাবক ঠাওরাইয়া ধমক দিয়া ডাক্তার আর কিছু রাখিলেন না। এতকাল কী করিতেছিল তাহারা, বসিয়া বসিয়া ঘাস কাটিতেছিল? আগে আনিতে পারে নাই গোপীকে? পা যদি এবার কাটিয়া বাদ দিতে হয়?

অপারেশন টেবিলে শুইয়া গোপী কপিলার হাত শক্ত করিয়া ছিল, গোঙাইয়া গোঙাইয়া সে তো কাঁদিতে থাকেই, কপিলাও মৃদু সুর তোলে কান্নার—তারপর ডাক্তারের ধমকে আচমকা স্তব্ধ হইয়া যায়। পরীক্ষা শেষ করিয়া ডাক্তার ভয়ানক কথা বলিলেন। এখানে রাখিয়া যাইতে হইবে গোপীকে তবে এ-কথাও তিনি বলিলেন যে, রাখা না-রাখা গোপীর বাপের খুশি, জোরজবরদস্তি নাই।

হাসপাতালের বারান্দায় পরামর্শ সভা বসিল। ডাক্তারের ধমকে রাসু বড় দমিয়া গিয়াছিল, সে আর কথা বলিল না—হয়তো এতক্ষণ গোপীর অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া মনটাও তার খারাপ হইয়া গিয়া থাকিতে পারে। ঘরের মধ্যে গোপী কাঁদিতে লাগিল—আগো মাসি, আমি থাকুম না, আমারে নিয়া যাও—আর বাহিরে কুবের, গণেশ আর যুগল গম্ভীর মুখে বলাবলি করিতে লাগিল যে এবার কী করা কর্তব্য। পরামর্শ করা একান্ত মিছে, ডাক্তার যে-কথা বলিয়াছে তারপর গোপীকে না রাখিলে চলিবে না এখানে, তবু তারা অজ্ঞ ও ভীরু গ্রামবাসী কিনা, দীর্ঘ পরামর্শ ছাড়া কোন সিদ্ধান্তই তারা করিতে পারে না।

গোপীকে মেয়ে ওয়ার্ডে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল। তারপর আর তাহাদের গোপীর কাছে থাকিবার উপায় রহিল না। আবার সেই চারটার সময় আসিয়া মেয়েটার সঙ্গে তাহারা দেখা করিতে পারিবে।

গোপী কপিলাকে কিছুতেই ছাড়িবে না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে বলিতে লাগিল, আগো মাসি, নিয়া যাও, কই থুইয়া যাও আমারে?

হাঁটিতে হাঁটিতে তাহারা ফিরিয়া গেল নদীর ঘাটে। পথে কিনিয়া লইল কিছু চিড়া-মুড়ি। এত বেলা অবধি কেহ তাহারা কিছু খায় নাই।

নীরবে সকলে জলযোগ শেষ করিল। এবার? কী করিবে তাহার এবার?

যুগলের থাকিবার উপায় নাই। নৌকা তাহার ভাড়া হইয়া আছে, সকালবেলাই তাহার দেবীগঞ্জে যাওয়ার কথা ছিল। কুবের এখন গ্রামে ফিরিবে তো? গ্রামের ঘাটে সকলকে নামাইয়া দিয়া যুগল সোজা চলিয়া যাইবে দেবীগঞ্জে।

কুবের বলিল, তোমরা যাও, বৈকালে মাইয়াটারে একবার না দেইখা আমি যামু না।

রাসু বলিল, আমিও থাকি আঁই?

কুবের বলিল, না রাসু, যা গিয়া তুই। কই থাকুম কী বিত্তান্ত ঠিক নাই, তুই থাইকা করবি কী?

গণেশ থাকিতে চাহিল, কুবের তাহাকেও বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিল। কপিলা অবশ্য ফিরিয়া যাইবে, তাই তার থাকা না-থাকার কথাই উঠিল না, কপিলাও কিছু বলিল না। কিন্তু কপিলাই

শেষ পর্যন্ত নৌকায় উঠিল না। সেও বিকাল পর্যন্ত এখানে থাকিবে, গোপীকে আর একবার না দেখিয়া কী সে ফিরিতে পারে? আহা, মাসী-মাসী বলিয়া মেয়েটা হয়তো কাঁদিয়া মরিতেছে। কেহ তাহাকে টলাইতে পারিল না। কুবের কত বলিল, নিজে সে কোথায় থাকিবে ঠিক নাই, মেয়েমানুষ সঙ্গে থাকিলে কত হাঙ্গামা, কত অসুবিধা—তাছাড়া লোকে বলিবে কী? কপিলা কোন কথাই কানে তুলিল না।

নৌকা চলিয়া গেল।

কুবের মুখ ফিরাইয়া দেখিল, নদীর বাতাস কপিলাকে স্পষ্ট করিয়াছে, শাড়িখানি মিশিয়া গিয়াছে অঙ্গে। বেগুনি রঙের শাড়িখানি পরিয়াই সে যে আজও পথে বাহির হইয়াছে, এতক্ষণ কুবের তো তাহা লক্ষ্য করে নাই। এতক্ষণে খেয়াল করিয়া সে যেন কেমন অসন্তোষ বোধ করিল। কপিলাকে লইয়া এখন সে কী করিবে, যাইবে কোথায়? মতলব করিয়াছে কপিলা? থাকিবার ওর কী প্রয়োজন ছিল?

কী দেখ মাঝি? কী ভাব? কপিলা বলিল।

জিগানের কাম কী তর? কুবের বলিল।

গোসা কর ক্যান? উই দেখ জাহাজ আহে।

সেইখানে নদীতীরে দাঁড়াইয়া তাহারা চাহিয়া থাকে, চক্রাকারে পাক দিয়া জাহাজ আসিয়া ভিড়ে জেটিতে। কী ভিড় হইয়াছে আজ জাহাজে! আজ পূজা শেষ, আজও দেশ-দেশান্তরে মানুষ গৃহে ফিরিতেছে। আর, কী অদৃষ্ট কুবেরের, মেয়েটাকে আজ এই বিদেশে হাসপাতালে ফেলিয়া রাখিয়া মূঢ়ের মত সে দাঁড়াইয়া আছে নদীতীরে, কোথায় যাইবে কী করিবে ঠিক নাই। ভোঁ দিয়া জাহাজ ছাড়িয়া যায়। নদীর আলোড়িত যায়। নদীর আলোড়িত জল ঢেউ তুলিয়া তীরে আছড়াইয়া পড়ে। মেয়েটার জন্য এমনি ঢেউ উঠিয়াছে কুবেরের বুকে।

হঠাৎ কপিলা বলিল, মাঝি পয়সা-কড়ি আনছ?

হ।

কত?

তা দিয়া কী কাম তর?

আমি কিছু আনছি, লাগলে নিও।

কপিলা আঁচলে গেরো বাঁধা পয়সা দেখাইল।

কুবের হাঁ না কিছু বলিল না। জেটি নির্জন হইয়াছে দেখিয়া খানিক পরে জেটিতে গিয়া ছায়ায় তাহারা বসিয়া রহিল। কুবের তাকায় না কপিলার দিকে, একটার পর একটা বিড়ি ধরাইয়া টানিতে থাকে—মিনিটে মিনিটে বিড়ি খাওয়ার মতই সে যেন বড়লোক।

ক্যামনে ফিরবা মাঝি? খানিক পরে কপিলা জিজ্ঞাসা করিল।

কেডা জানে? যেমন কাণ্ড তর কপিলা। তরে নিয়া কী যে করুম...

আমার লাইড়া ভাইব না মাঝি।

এতক্ষণে কী মনে করিয়া কুবের হাসিল, বড় পোলাপান তুই কপিলা। সোয়ামী শুইনা কী কইব তর ভাবছস নি?

কউক!

তা বৈকি! কলঙ্ক কিনিবার সাধ যে কপিলার ষোল আনা দেখা যায়? কুবের গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে। এ তো ভাল কথা নয়। এক বাড়িতে যারা বাস করে, শুধু দুর্নাম কিনিবার জন্য এখানে তাদের পড়িয়া থাকিবার কোন মানে হয় না। শুধু গোপীর জন্যই কী কপিলা রহিয়া গেল? গোপীকে সে এত ভালবাসে? কে জানে! কপিলার মন বুঝিবার ক্ষমতা ভগবান কুবেরকে দেন নাই।

বেলা পড়িয়া আসিলে দু'জনে হাসপাতালে গেল। কুবেরের এবার প্রথম মনে হইল থাকিয়া বুঝি ভাল করিয়াছে কপিলা। নতুবা এমন করিয়া গোপীকে সে নিজে তো সান্ত্বনা

কপিলা না থাকিলে বুক বাঁধিয়া সে সময় কে থাকিত গোপীর কাছে? গোপীর হাঁটুর হাড়ই শুধু ভাঙে নাই, মস্ত একটা বাঁশের গোঁজ ঢুকিয়া গিয়াছিল মাংসের মধ্যে, পা ফুলিয়া সেটাকে আড়াল করিয়া ফেলিয়াছে। ডাক্তার এ-বেলা সেটা টানিয়া বাহির করিলেন, তারপর ভাঙা হাড়টা যতদূর সম্ভব স্বস্থানে বসাইয়া কোমরের কাছ হইতে পা পর্যন্ত কাঠের তক্তা বসাইয়া বাঁধিয়া দিলেন ব্যাণ্ডেজ। কুবের এসব দেখিল না, বাহিরে বসিয়া সে শুধু গোপীর আর্তনাদ শুনিল।

দু'জনে যখন তাহারা হাসপাতাল হইতে পথে নামিয়া আসিল, তখন সন্ধ্যা হইতে বেশী বাকি নাই। দূরে বিসর্জনের বাজনা বাজিতেছিল। গ্রামেই এখন তাহাদের ফিরিতে হইবে। এখানে রাতে কাটাইবে কোথায়? কাল আবার কুবের আসিয়া গোপীকে দেখিয়া যাইবে। নদীর ঘাটে গিয়া কুবের নৌকায় নৌকায় চেনা মাঝি খুঁজিয়া বেড়াইল। চেনা মাঝি দু'চারজন মিলল বটে কিন্তু আজ বিজয়ার সন্ধ্যায় নৌকা তো কেহ খুলিবে না। দেবীগঞ্জের দিকে যাদের যাওয়া দরকার ছিল, দিনে দিনে তারা চলিয়া গিয়াছে। তবে গহনার নৌকা ছাড়িবে একটা, কুবের ইচ্ছা করিলে ভাড়া দিয়া যাইতে পারে। নতুবা কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করুক, যে নৌকাই কেতুপুরের দিকে যাক তাহাতে গ্রামে ফিরিতে পারিবে।

কত নাও যাইবে কাইল, পয়সা দিয়া ক্যান যাইবা কুবের বাই? বলিয়া পরিচিত মাঝি কুবেরকে নৌকায় রাত্রিযাপন করিতে অনুরোধ করে। শুধু পরিচিত মাঝি কেন, পদ্মানদীর মাঝি সে, পদ্মানদীর যে-কোন মাঝির নৌকার সঙ্গে একত্র এখানে রাত কাটাইয়া গিয়া কাল গ্রামে মুখ দেখাইবে কী করিয়া? কী বিপদেই কপিলা তাহাকে ফেলিয়াছে।

পয়সা দিয়া গহনার নৌকায় যাওয়া ছাড়া উপায় নাই। কত ভাড়া লইবে কে জানে! জিজ্ঞাসা করিতে গহনার নৌকার মাঝি বলে, সোনাখালি হইয়া তীরে তীরে তাহারা দেবীগঞ্জ পৌঁছায়, পদ্মা পার হইয়া কুবেরকে কেতুপুরে তাহারা নামাইয়া দিতে পারিবে না। হাসাইলের খাল পর্যন্ত তাহারা তীর ঘেঁষিয়া চলিবে, কুবের সেখানে নামিতে পারে, ভাড়া মাথাপিছু তিন আনা।

হাসাইলের খাল হইতে কেতুপুর দু-ক্রোশের কম নয়। এই রাত্রে অতখানি পথ কপিলা হাঁটিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। কুবের জিজ্ঞাসা করে, কী করি কপিলা?

কপিলা বলে, না গেলাম আইজ? কাইল বিয়ানে গোপীরে দেইখা মেলা করুম?

থাকুম কই? নায়?

তাই কি হয়! ডাকাত না গুণ্ডা নৌকার মাঝি কে জানে, কপিলা কি পারে এই নদীর ঘাটে খোলা নৌকায় শুইয়া থাকিতে? ওই তো ঘাটের হোটেল দেখা যায়, ওখানে ঘর ভাড়া নেওয়া যাক।

কী আর করিবে কুবের, দরদস্তুর করিয়া ছ'আনায় বড় একটা ঘরের একদিকে চাঁচের বেড়ায় ঘেরা স্থানটুকু ভাড়া করে। দরজা বা ঝাঁপ কিছুই নাই। ঢুকিবার জন্য একটু ফাঁক রাখিয়া ঘিরিয়া দিয়াছে। ঘরের মধ্যে সারি সারি মোটা পাটি পাতা, অতিথিরা রাত্রে শয়ন করিবে—ঘেরা স্থানটুকুর মধ্যে একখানা পাটিতেই মেঝের প্রায় সবটা ভরিয়া গিয়াছে। বাহিরে খোলা চালার নীচে খাওয়ার জায়গা, রান্নাঘরেও কতকগুলি পিঁড়ি পড়ে, চালাটার মাঝখানে একটা কালি-পড়া লণ্ঠন রাখা হইয়াছে, বাকি সর্বত্র জ্বলিতেছে কেরোসিনের কুপি।

কুবের গিয়া চালার নীচে বসিয়া খাইয়া আসে। চালার বাহিরে সকলের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া খোলা আকাশের নীচে খায় কপিলা। তারপর একপয়সার পান কিনিয়া আনে কুবের, ঘেরা স্থানটুকুর মধ্যে বসিয়া দু'জনে নীরবে পান চিবায়। সারাদিন কত হাঙ্গামা কত হাঁটাহাঁটি গিয়াছে, দুপুরে স্নান হয় নাই, পেটে ভাত পড়ে নাই, ক্রমে ক্রমে দু'জনেরই ঢুল আসিতে থাকে। আর একটু রাত হইলে কুবের উঁকি দিয়া দেখে, কাপড় মুড়ি দিয়া কেহ কেহ পাটিতে শুইয়া পড়িয়াছে, কেন পাটিতে বসিয়া কেহ টানিতেছে তামাক।

কুবের উঠিয়া দাঁড়ায়, বলে, শো কপিলা।

তুমি কই যাও?

উই প্যাটিতে শুই গিয়া আমি, যামু কই?

ক্ষীণ ভীরু কণ্ঠে কপিলা বলে, না যাইও না মাঝি।

কুবের কি রাগিয়া যায়? কড়াসুড়ে জিজ্ঞাসা করে, কী করুম তবে?

ডরামু মাঝি।

কী আর করিবে কুবের, আবার সে পাটিতে বসে। কপিলা তাহার চাদরখানা পুঁটুলি করিয়া তাহাকে বালিশ করিয়া দেয়। তার নিজের মাথায় দেওয়ার জন্য ছোট একটি পিঁড়ি আছে। কুবের শুইয়া পড়িলে এতক্ষণে কপিলা চুল খুলিয়া দেয়, আঙুল দিয়া চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে বলে, গোপীর লাইগা পেরানডা পোড়ায় মাঝি, স্যায় বুঝি ডরাইয়া কাইন্দা মরে।

বুঝিতে পারা যায় কপিলা কাঁদিতেছে।

কেডা জানে কবে মাইয়া সাইরা উঠ্যা বাড়িত যাইব। মাইয়াবে ফেইলা ক্যামনে ফিরুম মাঝি কাইল?

কুবের কাঠ হইয়া পড়িয়া থাকে। এখানে কাঁদিতেছে কপিলা, ওখানে মালাও হয়তো কাঁদিতেছে এখন। পথের দিকে চাহিয়া কত কী হয়তো ভাবিতেছে মালা। আর গোপী কী করিতেছে তা যেন ভাবাও যায় না।

পরদিন ভোরে আগে ঘুম ভাঙিল কপিলার। হাই তুলিয়া সে উঠিয়া বসিল, ঠেলা দিয়া কুবেরকে তুলিয়া দিল। বেড়ার বাহিরে পাটিতে এখনো রাত্রির অতিথিরা নাক ডাকিতেছে, শুধু বাহিরের কাছে কেরোসিন কাঠের বাক্সে বসিয়া তামাক টানিতেছে হোটেলের মালিক। রান্নাঘরের দাসী উনানের ছাই তুলিতেছে। কপিলাকে দেখিয়া ঘুমন্ত কুকুরটা উঠিয়া দাঁড়াইয়া লেজ নাড়িতে লাগিল।

মৃদু মধুর শীত পড়িয়াছে। কুবেরের চাদরখানা পরিয়া কপিলা প্রথমে নদীতে ডুব দিয়া আসিল, তারপর স্নান করিতে গেল কুবের। কুবের ফিরিয়া আসা পর্যন্ত কপিলা ঘেরা স্থানটুকুর মধ্যে লুকাইয়া রহিল। পুরুষের দৃষ্টিপাতে আজ বড় লজ্জা করিতেছে কপিলার, দিনের আলোয় আজ তার মনে হইতেছে জগৎসুদ্ধ সকলেই বুঝি জান যার পাশে শুইয়া সে রাত কাটাইয়াছে স্বামী সে তাহার নয়।

মুড়ি আর বাতাসা কিনিয়া কুবের ফিরিয়া আসিল। দু-মুঠা খাইয়া কপিলা বলিল, আর সে খাইবে না। না খাক, কুবেরের পেটে জায়গা আছে ঢের। ধীরে ধীরে মুড়ি আর বাতাসা শেষ করিয়া বলিল, ল, যাই হাসপাতালে।

তখন সবে রোদ উঠিয়াছে। এত সকালে গোপীর সঙ্গে তাহারা দেখা করিতে পারিল না। ন'টা পর্যন্ত হাসপাতালের সামনে বসিয়া থাকিতে হইল। তারপর ঘণ্টাখানেক গোপীর কাছে থাকিয়া, তাহাকে অনেক আশ্বাস ও সান্ত্বনা দিয়া ঘাটে ফিরিয়া আসিল। জহরের শালা নূরুলের নৌকা কাঠের বোঝা নামাইয়া দেবীগঞ্জে ফিরিয়া যাইতেছিল, সেই নৌকায় তাহারা উঠিয়া বসিল।

গ্রামের ঘাটে নামিয়া কুবের বলিল, বাড়িত যা কপিলা, আমি গণেশের লগে দেখা কইরা যাই।

বাড়িতে যদি ঝড়ঝাপটা ক্রন্দন ঘনাইয়া থাকে তবে প্রথম ধাক্কাটা কপিলার উপর দিয়াই যাক। কপিলা কিন্তু একা বাড়ি যাইতে রাজী হইল না, রুখিয়া বলিল, আরে পুরুষ!

তখন আর কথাটি না বলিয়া কুবের হন হন করিয়া বাড়ির দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। কপিলা পিছাইয়া পড়িল। পথে যার সঙ্গে দেখা হইল সেই সাগ্রহে গোপীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল, চাপা হাসি ঢাকা পরিহাস রূঢ় ইঙ্গিত কিছুই কারো কাছে জুটিল না কুবেরের। এত কি সুনাম সে রাখিয়াছিল গ্রামে যে কপিলার সঙ্গে একটা পুরা রাত্রি অজানা স্থানে অতিবাহন করিয়া

আসিয়াও সে সুনাম নিটোল অক্ষত দেখিতে পাইতেছে? ব্যাপারখানা কী? চলিতে চলিতে হঠাৎ কুবেরের মনে পড়ে, দুজন তো নয়, গোপীকে ধরিলে তারা যে তিনজন! গ্রামের লোকে তাকে আর কপিলাকে হোটেলের চাঁচের বেড়ার নির্জনতায় পৃথকভাবে কল্পনা করে নাই, তাদের সঙ্গে গোপীকেও একত্র চিন্তা করিয়াছে। কারো মনে তাই সন্দেহ জাগিবার অবকাশ থাকে নাই।

কুবের দাঁড়াইল। কপিলা কাছে আসিলে বলিল, দেখ্ কপিলা, জিগাইলে কইস রাইতে হাসপাতালে ছিলাম গোপীর কাছে।

কপিলা মাথা নাড়িয়া বলিল, দূর অ! মিছা কথা আমি কই না মাঝি। বলিয়া খানিক আগে কুবের যেমন করিয়াছিল তেমনি হনহন করিয়া কপিলা আগাইয়া গেল। কে জানে কী আছে কপিলার মনে। বরণ না মানিয়া কাল ও আমিনবাড়িতে থাকিয়া গেল, আজ বারণ না মানিয়া সত্য কথা বলিতে চায়! বলুক। পুরুষ মানুষ কুবের, কী ভয় তার? কপিলার সত্যবাদিতার ফলে যদি কেহ ভোগে, ভুগিবে কপিলাই।

বাড়ি গিয়া কুবের দেখিল, মালার কাছে কপিলা সবিস্তারে আমিনবাড়ির কাহিনী বলিতেছে। কাছে চাটাইয়ের উপর সে বসিয়া পড়িল। মালাকে সবই বলিবে নাকি কপিলা, হোটেলে রাত্রি যাপনের কথা পর্যন্ত? কপিলা বলি যায়—সন্ধ্যাবেলায় কী বিপদেই তারা পড়িল। হাসপাতালে থাকিতে দিল না, ফিরিবার নৌকা পাওয়ার নৌকা পাওয়া গেল না, কোথায় যায়? শেষে এক মুক্তারবাবু দয়া করিয়া তাদের আশ্রয় দিলেন।—কী নম য্যান মাঝি মুক্তারবাবুর? মুখ ফিরাইয়া কপিলা জিজ্ঞাসা করিল কুবেরকে।

কুবের থতমত খাইয়া বলিল, কেডা জানে?

জিগাও নাই?

কুবের মাথা নাড়িল।

দুইদিনের মধ্যে আর গোপীকে দেখিতে যাওয়া হইল না। জীবিকা অর্জন করিতেই কুবের ব্যস্ত হইয়া রহিল। পরের দিন সকালে মালা ভয়ানক গোলমাল আরম্ভ করিয়া দিল। আই গো কুবেরের পাষাণ প্রাণ! মেয়েটাকে সে যে কোথায় রাখিয়া আসিল আর কী তাহার খবর লইতে ইইবে না! জন্মের মত রাখিয়া আসিয়াছে নাকি মেয়েকে, এমন যে নিশ্চিন্ত হইয়া আছে কুবের?

সারারাত মাছ ধরিয়া কুবের তখন বাড়ি ফিরিয়াছে। ভাত খাইয়া দুপুরবেলা আমিনবাড়ি রওনা হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়া সে মালাকে শান্ত করিল। তারপর ঘুমাইতে গের পিসীর ঘরে। ঘুমাইয়া উঠিয়া স্নান করিয়া আসা অবধি সে আড়চোখে চাহিতে লাগিল কপিলার দিকে। কে জানে কপিলা আজ সঙ্গে যাইতে চাহিতে কিনা। কপিলা বলে না, একবার সামনে আসে একবার অন্তর্হিত হয়।

খাইতে বসিয়া কুবের বলে, খাইয়া উঠ্যাই আমিনবাড়ি রওনা দিমু কপিলা।

ফিরবা না আইজ?

কেডা জানে! হয়তো হোটেলে থাকুম।

হোটেলে ক্যান? থাইকো, মুক্তারবাবুগো বাড়ি থাইকো! বলিয়া কপিলা হাসে।

লজ্জা পাইয়া ঘাড় হেঁট করিয়া কুবের খাইয়া যায়। না, কপিলার মনের হদিস পাইবার ভরসা তাহার আর নেই। কখন কী বলিবে, কী করিবে, অনুমান করিতে পারা পায় না।

খাইয়া উঠিয়া কুবের ময়লা চাদরটি গায়ে জড়াইয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইল। বড় সে গম্ভীর হইয়াছে, যেন এমন একটা অপমান সম্প্রতি তাহার জুটিয়াছে যাহা তাহার প্রাপ্য নয়। বড় নির্মম কপিলা, বড় দুর্বোধ্য তাহার ব্যবহার।

রওনা হওয়ার সময় কুবেরকে চার আনা পয়সা দিয়া কপিলা বলিল, গোপীরে ফল কিনা দিবা মাঝি। তারপর মালাকে বলিল, মাঝির লগে যামু নাকি দিদি?

মালা বলিল, তর দিয়া কাম কী?

তখন কপিলা বিষণ্ণভাবে একটু হাসিল কুবেরের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মাঝি কি কও?

কুবের মাথা নাড়িল, তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। আমিনবাড়ি সে পৌঁছিল অপরাহ্নে, কপিলার পয়সা দিয়া স্টীমারঘাট হইতে কমলালেবু কিনিয়া গোপীকে দেখিতে গেল, নদীতীরে ফিরিয়া আসিল সন্ধ্যাবেলা। আজ বাড়ি ফিরিবার নৌকার অভাব নাই, তবু কুবরের কেন যেন ফিরিতে ইচ্ছা হইতেছিল না, অনেক রাত্রি অবধি নদীতীরে বসিয়া থাকিয়া সে হোটেলে ভাত খাইতে গেল। খাইতে খাইতে যে শুনিতে পাইল বাজারে আজ ভাসান যাত্রা হইতেছে। আজ কুবের কাছে না থাকিলে কেহ ভয় পাইবে না। খাইয়া উঠিয়া সে বাজারের দিকে পা বাড়াইল।

বাজারে টিনের চালার নীচে যেখানে তরিতরকারির দোকান বসে সেখানে যাত্রার আসর বসিয়াছে, লোক জমিয়াছে, ঢের। কুবের একপাশে বসিয়া পড়িল। পানবিড়ির দোকান ছাড়া এক রাত্রে পসরা সাজাইয়া কেহ নাই, রূপ-কন্যারও যাত্রা শুনিতে আসিয়াছে। পেশাদার দল নয়, আলু-বেচা তেল-বেচা মানুষের শখের দল, অনেকে হয়তো পড়িতেও জানে না; একে ওকে দিয়া পড়াইয়া পার্ট মুখস্থ করিয়াছে, শক্ত শক্ত শব্দই উচ্চারণ হয় না, তাই হাস্যকর রকেম ভাঙিয়া জিহ্বার উপযোগী করিয়া নিয়াছে—বক্তৃতাগুলি কথ্য ও শুদ্ধ ভাষায় এক অপরূপ খিঁচুড়ি। পোশাক-পরিচ্ছদের যেমন অভাব, অভিনেতা নির্বাচনে কাণ্ডজ্ঞানেরও তেমনি অভাব। বালক লখীন্দরের পাশে তার চেয়ে একহাত বেশী লম্বা বেহুলা নির্বিকার চিত্তে পার্ট বলে—গলাটি মিহি বলিয়া আর চমৎকার মেয়েলী ঢঙে অভিনয় করিতে পারে বলিয়া ওকে বেহুলা করা হইয়াছে, আর কিছু দেখিবার প্রয়োজন হয় নাই।

তবু রাত জাগিয়া ভিড় করিয়া সকলে ভাসান-যাত্রা শোনে, একবার নয় বহুবার। ভাঙ্গা হারমোনিয়াম আর ঢ্যাপসা তবলার সঙ্গত, মশালের লাল আলো, আলু-বেচা তেল-বেচা অভিনেতা—তবু কী মোহ এ যাত্রার! কুবের ঠায় বসিয়া থাকে। ঢিমাইয়া ঢিমাইয়া অভিনয় চলে, মা মনসা একটা গান করেন, চাঁদ-সদাগর দুটো কথা বলে, মৃত লখীন্দর উঠিয়া একটা গান করিয়া আবার মরিয়া যায়। কোথায় কখন কোন্ দৃশ্যের শুরু, সর্পদ্রষ্ট লখীন্দরের জন্য বেহুলার বহুল বিলাপের পর মা-মনসা আবার কোন্ গান গাহিয়া চাঁদ-সদাগরকে ভয় দেখাইয়া যান যে তাঁকে পূজা না করিলে লখীন্দরকে সাপে কাটিবে, এসব বুঝিবার দরকার হয় না। কুবের মন দিয়া যাত্রা শোনে। রাত্রি শেষ করিয়া যাত্রা শেষ হইলে পেঁয়াজের যে খালি বস্তাটার উপর সে এতক্ষণ.বসিয়াছিল তার উপরেই কাত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। কিন্তু বেশিক্ষণ ঘুমানোর সুযোগ সে পায় না। সকাল হইতে না হইতে তাহাকে ঠেলিয়া তুলিয়া দেওয়া হয়। সেখানে এবার দোকান বসিবে।

অনেক বেলায় সে গ্রামে ফেরে। দেখিতে পায় বাড়িতে অতিথি আসিয়াছে। কপিলার স্বামী শ্যামাদাস।

লম্বা চওড়া প্রকাণ্ড জোয়ান মানুষ, ঘাড়-ছোঁয়া বাবরি চুল মাথায়, বোঁচা নাকটায় নিচে একজোড়া উদ্ধত গোঁফ— খুঁটিতে ঠেস দিয়া বসিবার ভঙ্গি দেখিলে মনে হয় বিশ্বজগতে কারো সে তোয়াক্কা রাখে না। কুবেরের মুখখানা ম্লান হইয়া যায়। কে জানে কেন আসিয়াছে শ্যামদাস!

শ্যামাদাসের আসিবার উদ্দেশ্য জানিতে বেশি দেরি হইল না। এ পক্ষের বৌটা তাহার মরিয়া গিয়াছে। কপিলাকে সে নিয়া যাইবে। কখন যাইবে? বেলা পড়িয়া আসিলে এক সময় রওনা হওয়া যাইবে, সে জন্য কী! কুবের যদি যদি খাতির করিয়া একটা দিন থাকিয়া যাইতে বলে তাতেও শ্যামদাসের আপত্তি নাই।

বসিয়া বসিয়া তাহারা কথাবার্তা বলে, কপিলা এক সময় আসিয়া ফিসফিস করিয়া স্বামীর কানে কী সব গোপন কথা বলে, তারপর হাসিয়া চলিয়া যায়, পিসির ঘরে ঢুকিবার আগে মুখ ফিরাইয়া চোখের একটা দুর্বোধ্য ইঙ্গিতও করে।

এত বেলায় কুবের ফিরিয়া আসিয়াছে, কই খাওয়ার কথা কপিলা তো কিছু বলিল না? কুবেরের ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা মনে রাখিবার প্রয়োজন কি কপিলার ফুরাইয়া গিয়াছে? গোপীর

কথাও তো কিছু সে জিজ্ঞাসা করিল না?

গায়ের চামড়াটা কুবেরের আজ বড় খসখস করিতেছিল, অনেকদিন তেল মাখা হয় নাই। শ্যামাদাস আসিয়াছে বলিয়াই কপিলা বোধহয় আজ চুলে আবার জবজবে করিয়া নারিকেল তেল দিয়াছে। কালো একটি বোতলে বিলাসিতার এই উপকরণটি কপিলা সর্বদা মজুদ রাখে, একটা কিছু উপলক্ষ পাইলেই বোতলটা কাত করে মাথায়। শ্যামাদাসকে বসিতে বলিয়া কুবের কপিলার কাছে একটু তেল চাহিল। কপিলা করিল কি, রাঁধিবার তেল-রাখা বাঁশের পাত্রটি আনিয়া বলিল, 'ধর মাঝি, হাত পাত।' কুবের হাত পাতিলে পাত্রটা সে একেবারে উপুড় করিয়া ধরিল, এক ফোঁটা তেলও কুবরের হাতে পড়িল না।

কপিলা বলিল, 'আই গো আই, ত্যাল তো নাই।'

বলিয়া কী হাসি কপিলার!

কুবের কথাটি বলিল না, বাঁশের পাত্রটি তার হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া এই দুপুরবেলায় অভুক্ত অবস্থায় গ্রামের ভিতর গিয়া দু পয়সার তেল কিনিয়া আনিল। কপিলাকে দেখাইয়া দাওয়ায় বসিয়া সর্বাঙ্গে ঘষিয়া ঘষিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া সে তেল মাখিল, নিজের দেহটিকে সে যেন কপিলার চুলের মতোই তেলে জবজবে করিয়া ছাড়িবে।

সারাদিন কপিলার সঙ্গে সে কথা বলিল না।

কিন্তু সন্ধ্যার পর মাছ ধরিতে যাওয়ার সময় তামাকের গোলাটা সঙ্গে লইতে ভুলিয়া গেল। নৌকায় গিয়া একা সে বসিয়া রহিল প্রতীক্ষায়, এই সময় গণেশ ও ধনঞ্জয় আসিয়া তাহার সঙ্গে যোগ দিল, তারপর মৃদু জ্যোৎস্নায় পদ্মার রহস্যময় বুকে নৌকা ভাসিয়া গেল, কিন্তু তামাক পৌঁছাইয়া দিতে কেহ আসিল না।

পরদিন কপিলাকে সঙ্গে করিয়া শ্যামাদাস চলিয়া গেল।

সাত

ইলিশের মরশুম শেষ হইয়া গেল। ধনঞ্জয়ের তিনটি নৌকা ইলিশ মাছ ধরার কাজে লাগানো হইয়াছিল, একটিতে থাকিত সে নিজে, অন্য দুটিতে তার দুই ছেলে। আশ্বিনের ঝড়ে একটি নৌকা ভাঙিয়া গিয়াছে। এবার একটি নৌকা সে রাখিল মাছ ধরার জন্য, অন্যটি লাগানো হইল ভাড়া খাটিবার কাজে। ছেলেরা মাছ ধরিবে, নিজে সে একজন লইয়া নৌকা বাহিবে।

কুবেরকে ধনঞ্জয় পছন্দ করে না। গণেশকে সে তার নৌকার মাঝি হইতে বলিল। কিন্তু গণেশ কিনা বোকা, সে গেল পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে কুবেরের কাছে।

কুবের রাগিয়া বলিল, যা যা খাটি গিয়া আজান খুড়ার নায়। আমারে জিগাস ক্যান!

কুবের অনুমোদন না করিলে তাহা হইবার নয়, গণেশ ধনঞ্জয়কে বলিয়া আসিল তার নৌকায় একা সে মাঝির কাজ করিবে না, কুবের যদি করে তবেই সে করিবে, নতুবা নয়। শুনিয়া ধনঞ্জয় বলিল, যা মর গিয়া তবে। পঞ্চাশ জন মাঝি রাখুম, কলের জাহাজ পাইছিস, না?

গণেশ তাহা জানে না। চিরদিন সে কুবেরের কথায় নির্ভর করিয়া আসিয়াছে, কলের জাহাজ হোক আর পান্সি হোক, কুবের যেখানে নাই গণেশও নাই সেখানে! কুবেরের দাওয়ায় বসিয়া সে নিশ্চিন্ত মনে তামাক টানিতে লাগিল, আর কুবের গম্ভীর চিন্তিত মুখে ভাবিতে লাগিল, এবার কী করিবে। মাঝিগিরিই সে করিবে সন্দেহ নাই, তবু গম্ভীর চিন্তিত মুখে অন্য কিছু করা যায় কিনা ভাবিতে কুবের চিরদিন বড় ভালবাসে। কপিলা চলিয়া যাওয়ার পর ক্রমে ক্রমে কুবের অভাব বাড়িয়অছে। ঘরের লক্ষ্মী যেন চলিয়া গিয়াছে কপিলার সঙ্গে, পরিপূর্ণভাবে ক্ষুধার নিবৃত্তি আর হইতেছে না। সময়টা পর্যন্ত পড়িয়াছে খারাপ। জিনিসপত্রের দাম চড়িয়া গিয়াছে। বর্ষায় একটা ফসল নষ্ট হইয়াছিল, পাটের কল্যাণে আমন ধানের ফসলও হইয়াছে

কম। চাষীদের ঘরে ধান নাই, টাকা নাই, আছে পাট— কুবেরের ঘরে কিছুই নাই। পাটের উপর চাষীর অনিশ্চিত মরণ বাঁচন, কুবেরর জীবনধারণ সুনিশ্চিত মাঝিগিরিতে—সেটা ভালমত জুটিতেছে না। একটা নৌকা যদি কুবেরের থাকিত! পদ্মার ঘাটে ঘাটে তবে সে কুড়াইতে পারিত জীবিকা, পরের নৌকায় লগি ঠেলিতে পাইবার ভরসায় থাকিতে হইত না।

ভোরবেলা এখন নদীর বুক জুড়িয়া থাকে কার্তিকের কুয়াশা, যদিও অগ্রহায়ণ আসিয়া গিয়াছে। জলের তল হইতে মাঠ ঘাট মাথা তুলিয়াছে। কোথাও রবিশস্যের চারা উঁকি দিয়াছে, কোথাও সব শস্যবীজ বপন করা হইতেছে। রাত্রে অল্প অল্প শীত করে, গায়ে, কাপড় দিতে হয়।

অনেক বেলায় সে গ্রামে ফেরে। দেখিতে পায় বাড়িতে অতিথি আসিয়াছে। কপিলার স্বামী শ্যামদাস।

লম্বা চওড়া প্রকাণ্ড জোয়ান মানুষ, ঘাড়-ছোঁয়া বাবরি চুল মাথায়, বোঁচা নাকটার নীচে একজোড়া গোঁফ্রখুঁটিতে ঠেস দিয়া বসিবার ভঙ্গি দেখিলে মনে হয় বিশ্বজগতে কারো সে তোয়াক্কা রাখে না। কুবেরের মুখখানা ম্লান হইয়া যায়। কে জানে কেন আসিয়াছে শ্যামদাস!

শ্যামদাসের আসিবার উদ্দেশ্য জানিতে বেশি দেরী হইল না। এ পক্ষের বৌটা তাহার মরিয়া গিয়াছে। কপিলাকে সে নিয়া যাইবে। কখন যাইবে? বেলা পড়িয়া আসিয়া এক সময় রওয়া হইয়া যাইবে, সেজন্য কী! কুবের যদি খাতির করিয়া একটা দিন থাকিয়া যাইতে বরে তাতেও শ্যামদাসের আপত্তি নাই।

বসিয়া বসিয়া তাহার কথাবার্তা বলে, কপিলা এক সময় আসিয়া ফিস-ফিস করিয়া স্বামীর কানে কী সব গোপন কথা বলে, তারপর হাসিয়া চলিয়া যায়, পিসীর ঘরে ঢুকিবার আগে মুখ ফিরাইয়া চোখের একটা দুর্বোধ্য ইঙ্গিতও করে।

এত বেলায় কুবের ফিরিয়া আসিয়াছে, কই খাওয়ার কথা কপিলা তো বলিল না? কুবেরের ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা মনে রাখিবার প্রয়োজন কি কপিলার ফুরাইয়া গিয়াছে? গোপীর কথাও তো কিছু সে জিজ্ঞাসা করিল না?

গায়ের চামড়াটা কুবেরের আজ বড় খসখস করিতেছিল, অনেকদিন তেল মাখা হয় নাই। শ্যামদাস আসিয়াছে বলিয়াই কপিলা বোধহয় আজ চুলে আবার জবজবে করিয়া নারিকেল তেল দিয়াছে। কালো একটি বোতলে বিলাসিতার এই উপকরণটি কপিলা সর্বদা মজুদ রাখে, একটা কিছু উপলক্ষ্য পাইলেই বোতলটা কাত করে মাথায়। শ্যামদাসকে বসিতে বলিয়া কুবের কপিলার কাছে একটু তেল চাহিল। কপিলা করিল কি, রাঁধিবার তেল-রাখা বাঁশের পাত্রটি আনিয়া বলিল, ধর মাঝি, হাত পাত। কুবের হাত পাতিলে পাত্রটা সে একেবারে উপুড় করিয়া ধরিল, এক ফোঁটা তেলও কুবেরের হাতে পড়িল না।

কপিলা বলিল, আই গো আই, ত্যাল ত নাই।

বলিয়া কী হাসি কপিলার!

কুবের কথাটি বলিল না, বাঁশের পাত্রটি হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া এই দুপুরবেলায় অভুক্ত অবস্থায় গ্রামের ভিতর গিয়া দু'পয়সার তেল মাখিল, দেহটিকে সে যেন কপিলার চুলের মতই তেল জবজবে করিয়া ছাড়িবে।

সারাদিন কপিলার সঙ্গে সে কথা বলিল না।

কিন্তু সন্ধ্যার পর মাছ ধরিতে যাওয়ার সময় তামাকের গোলাটা সঙ্গে লইতে ভুলিয়া গেল। নৌকায় গিয়া একা সে বসিয়া রহিল প্রতীক্ষায়, এই সময় গণেশ ও ধনঞ্জয় আসিয়া তাহার সঙ্গে যোগ দিল, তারপর মৃদু জ্যোৎস্নায় পদ্মার রহস্যময় বুকে নৌকা আসিয়া গেল, কিন্তু তামাক পৌঁছাইয়া দিতে কেহ আসিল না।

পরদিন কপিলাকে সঙ্গে করিয়া শ্যামদাস চলিয়া গেল।

কুবেরের মন বড় খারাপ। কিছু ভাল লাগে না। গোপী হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া

আসিয়াছে. ভাঙা হাঁটুটি তাহার শক্ত হইয়া গিয়াছে, সে হাঁটিতে পারে না। ভবিষ্যতে আবার কোথায় হাড় ভাঙিয়া ঠিক করিয়া দিলে খোঁড়াইয়া হয়তো সে হাঁটিতে পারিবে, চলন তার স্বাভাবিক হইবে না কোনদিন। যুগলকে জামাই করার আশা আর নাই। মেয়ের বিবাহ দিবার এবং সে উপলক্ষ্যে কিছু টাকা পাইবার ভরসাও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কী উপায় হইবে গোপীর?

রাসু মাঝে মাঝে আসে, বেশ বুঝিতে পারা যায়, গোপীর অবস্থা দেখিয়া সে বড়ই দুঃখিত হইয়াছে। গোপীর হাঁটুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ডাক্তার কী বলিয়াছে রাসু খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া জিজ্ঞাসা করে, এক-একদিন টিপিয়া-টুপিয়া নিজেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে যায়। কী সন্তর্পণে সে যে স্পর্শ করে গোপীর হাঁটু!

মালা হঠাৎ রাসুকে বড় খাতির করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যুগল অবস্থাপন লোক, গোপীর দিকে সে আর ফিরিয়াও চাহিবে না চালচুলা হীন রাসু হয়তো গোপীকে গ্রহণ করিতে পারে।

বড় দোটানায় পড়িয়াছে রাসু। আজ সে চাহিলেই গোপীকে পায়, এক পয়সা পণও তাহাকে দিতে হইবে না—কিন্তু সে কি এই গোপীকে চাহিয়াছে, এই পঙ্গু মেয়েটাকে? খোঁড়া মালাকে লইয়া কুবের সংসার পাতিয়াছে, অসুখী কুবের নয়, দারিদ্র্যের পীড়নে সে কষ্ট পায় বটে কিন্তু পারিবারিক জীবনটি তাহার কামনা করিবার মত—গোপীকে লইয়া হয়তো সে এমনি সংসার পাতিয়া বসিতে পারিবে। তবু মনটা খুঁতখুঁত করে রাসুরে। খোড়া বৌ! হয়তো জীবনে কোন দনি সে দাঁড়াইতে পারিবে না—যদি পারেও লাঠি ধরিয়া খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া হাঁটিবে, পায়ের পঙ্গুত্বের জন্য দেহের হয়তো তার পুষ্টি হইবে না চিরকাল কুৎসিত দেখাইবে তাহাকে।

শেষ পর্যন্ত গোপীর পায়ের অবস্থাটা কী দাঁড়ায় দেখিয়া কর্তব্য নির্ণয় করার জন্য প্রতীক্ষা করাও বিপজ্জনক। হাসপাতালের ডাক্তার যদি পা'টিকে ঠিক আগের মত করিয়া দেয়? মরা মানুষ বাঁচায় ডাক্তার, কত ওষুধ কত যন্ত্রপাতি ডাক্তারের, একটা ভাঙা পা ঠিক করিয়া দেওয়া তাহার পক্ষে কঠিন নয়। তখন রাসুকে কি কুবের জামাই করিতে চাহিবে? আপসোস করিয়া মরিতে হইবে রাসুকে তখন।

সাইরা যাইব কয় নাই ডাকতর? রাসু জিজ্ঞাসা করে।

হ। কুবের জবাব দেয়।

কিন্তু একথা রাসু বিশ্বাস করিতে পারে না। গোপীর পা যে কিছু দিনের মধ্যে ঠিক হইয়া যাইবে রাসুকে তাহা বিশ্বাস করাইতে, এত বেশী আগ্রহ দেখার কুবের যে রাসু সন্দিগ্ধ হইয়া ওঠে।

হঠাৎ একদিন সে করে কি, চলিয়া যায় আমিনবাড়ি। হাসপাতালে গিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করে, বলে যে সে গোপীর আত্মীয়—কোনমতেই কি গোপনয়ি পাটি আগের মত করিয়া দেওয়া যায় না? ডাক্তারের সামনে হাত জোড় করিয়া সে দাঁড়াইয়া থাকে। কত ব্যাকুক, কত উৎকণ্ঠিত আত্মীয় সে গোপীর!

না, গোপীর দরদী আত্মীয়কে ভরসা ডাক্তার দিতে পারেন না!

রাসু চিন্তিত মুখে গ্রামে আসে। আবার সে দেখিতে যায় গোপীকে। শীতের কুয়াশার মতো ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে মেয়েটা, শীর্ণ রোগা মুখখানিতে জ্বলজ্বল করিতেছে দুটো চোখ, একটা খড়ের পুঁটলির উপর ভাঙা পাটি রাখিয়া এলাইয়া পড়িয়া আছে বিছানায়।

রাসু মমতা বোধ করে। ময়নাদ্বীপে একে একে স্ত্রীপুত্রকে হারাইয়া যে নিষ্ঠুর বেদনায় বুক তার দীর্ণ হয়ে গিয়াছিল, তেমন বেদান লক্ষ স্ত্রীপুত্রকে হারাইয়াও আর সে কোন দিন অনুভব করিবে না—গোপীর ভাঙ্গা পা'খানা দেখিলে মনটা শুধু কেমন করিয়া ওঠে!

একদিন সকালে হোসেন মিয়া কুবেরের বাড়ি আসিল।

মৃদু মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কাম মিলে নাই কুবের বাই?

কুবের মাথা নাড়িয়া বলিল, না?

হোসেন বলিল, জান দিয়া তোমাগো দরদ করি, ক্যামনে ভালা করুম তোমাগো হুশ থুই কুবের যাই। কাম করবা আমার লায়?

মনে মনে কুবের ভয় পাইল। কী মতলব করিয়াছে হোসেন মিয়া? যাচিয়া কাজ দিতে চায় কেন? হোসেন মিয়ার উপকার গ্রহণ করিলে শেষ পর্যন্ত মঙ্গল নাই কুবের তাহা ভাল করিয়াই জানে, কোন স্বার্থ সাধিবার জন্য কবে কাকে হোসেন মিয়ার প্রয়োজন হয় তাই শুধু কেহ জানিতে পারে না; কুবের একবার ভাবিল, না, হোসেন মিয়ার নৌকায় সে কাজ করিবে না। কিন্তু একথা বলা যায় না। লোকটার মৃদু হাসি-ভরা মুখের দিকে চাহিয়া যত ভয় করে কুবেরের, সেই ভয়ের তাড়নাতে ওকেই যেন জড়াইয়া ধরিবার প্রয়োজন তত বাড়ে। তাছাড়া, আজ পর্যন্ত ক্ষতি সে কিছুই তাহার করে নাই, বরং উপকার করিয়াছে সে অনেক।

কুবের জোর করিয়া আগ্রহ দেখাইয়া বলিল, হোসেন মিয়ার নৌকায় কাজ পাইলে সে বর্তিয়া যায়। সে যেন জানিত না কুবের রাজী হইবে, এমনভাবে হোসেন খুশী হইয়া গেল—মানুষ বশ করার মত কায়দাই লোকটা জানে! কী কাজ করিতে হইবে কুবেরকে, কী সে পাইবে এসব কথা কিছুই উঠিল না। হোসেন শুধু বলিল, মাঝে মাঝে দশ-পনের দিনের জন্য কুবেরকে বাড়িঘর ছাড়িয়া যাইতে হইবে, যাইতে হইবে পদ্মার দূরতম বন্দরে, যেখানে যেখানে হোসেন মিয়ার বাণিজ্য আছে। কিসের বাণিজ্য হোসেন মিয়ার? কে তা জানে? কে সে প্রশ্ন করিবে? কুবের শুধু সায় দিয়া গেল—তার আপত্তি নাই। সপরিবারে ময়নাদ্বীপে যাওয়া ছাড়া যেখানে যাইতে বলুক, কুবের সেইখানেই যাইবে, যা করিতে বলুক তাই করিবে। প্রতিদানে জীবিকা পাইলেই হইল।

গণেশের কথাটা কুবেরের মনে পড়িতেছিল, তারজন্য ধনঞ্জয়ের নৌকায় এক সে কাজ নেয় নাই। আজ গণেশকে ফেলিয়া হোসেন মিয়ার নৌকায় কাজ নেওয়া তার কি উচিত হইবে? কুবের উশখুশ করে। গণেশের কথাটা বলিতে গিয়া মুখে আটকাইয়া যায়। বন্ধুত্ব বজায় রাখিতে গিয়া যদি তার নিজের কাজটা ফসকাইয়া যায়? তাছাড়া তার সঙ্গে গণেশও হোসেন মিয়ার খপ্পরে আসিয়া পড়িবে এটা কুবেরের ভাল লাগিতেছিল না।

তবু, গণেশেরও একটা উপায় হওয়া চাই।

ঢোক গিলিয়া কুবের জিজ্ঞাসা করিল, গণেশকে নিতে পারে না হোসেন মিয়া? গণেশ বলবান, পাকা মাঝি গণেশ—বুদ্ধিটা একটু ভোঁতা বটে কিন্তু জেলেপাড়ায় ওর মত লগি ঠেলিতে, দাঁড় টানিতে আর কেহ পারে না।

হোসেন বলিল, ডাইকা আনবা গণেশেরে?

অখন?

হ, যাও, বাতচিত কইয়া যাই।

কুবের অনিচ্ছার সঙ্গে উঠিয়া গেল। হোসেন মিয়াকে একা বাড়িতে রাখিয়া যাইতে তার ভরসা হয় না। গণেশকে নিয়া ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিল, ইতিমধ্যে সংবাদ পাইয়া আমিনুদ্দি আসিয়া হোসেন মিয়ার কাছে বসিয়াছে। আমিনুদ্দিকে দেখিলে চিনিতে পারা যায় না। কয়েকদিন আগে জহরের ছেলের সঙ্গে মেয়েটার সে বিবাহ দিয়াছে, স্ত্রীপুত্রের অপমৃত্যুর পর এত তাড়াতাড়ি মেয়ের বিবাহ দিতে সকলে তাহাকে বারণ করিয়াছিল, কারো কথা শোনে নাই। যেটুকু বন্ধন ছিল তাও সে অধীর হইয়া চুকাইয়া ফেলিয়াছে। এবার সে কী করিবে সেই জানে!

কুবেরকে দেখিয়া আমিনুদ্দি বলিল, ময়নাদ্বিপি যামু গিয়া কুবির, কাইজা মনে থুইও না, কসুর মাপ কইরো বাই।

ময়নাদ্বিপি যাবা? ক্যান?

কই যামু, নাত?

কুবের ও গণেশ অভিভূত হইয়া আমিনুদ্দির দিকে চাহিয়া রহিল। সকলকে হারাইয়া রাসু একদিন ময়নাদ্বীপ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল, এখানে আমিনুদ্দি সকলকে হারাইয়া ময়নাদ্বীপে যাইতেছে। আমিনুদ্দিকে ওখানে নেওয়ার জন্য হোসেন অনেকদিন হইতে চেষ্টা করিতেছিল, এতদিনে তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল—হোসেনের কোন ইচ্ছা কি অপূর্ণ থাকিবার নয়? ভয়ে তাহারা হোসেন মিয়ার দিকে তাকাইতে পারে না। মনে হয় আশ্বিনের ঝড় নয়, হোসেন মিয়াই গাছ ফেলিয়া আমিনুদ্দির কুটিরখানা চূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। লোকে যে বলে কোন কোন মানুষের ভূত-প্রেতের উপর কর্তৃত্ব থাকে, হোসেনেরও তাই আছে কিনা কে জানে! একদিন রাত্রে সে যে হোসেন মিয়ার পকেট হইতে পয়সা চুরি করিয়াছিল, সে কথা মনে করিয়া কুবেরের বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করিতে থাকে। এমন অলৌকিক শক্তি যার, সে কি টের পায় নাই চুরির কথা? ঘরের চালা হয়তো নয়, হয়তো হোসেনের পোষমানা অন্ধকারের অশরীরী শক্তি সে দিন গোপীর হাঁটু ভাঙিয়া দিয়াছিল, বাড়ি ছিল না বলিয়াই কুবের সে দিন বাঁচিয়া গিয়াছিল নিজে? মেঘলা অমাবস্যার অন্ধকারের মত অতল কুসংস্কার নাড়া খাইয়া কিছুক্ষণের জন্য কুবেরের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

খানিক পরে আমিনুদ্দি উঠিয়া গেল। তখন হোসেন কুবের ও গণেশকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল ময়নাদ্বীপে গিয়া মঙ্গলই হইবে আমিনুদ্দির, এখানে শোকে দুঃখে কাতর হইয়া থাকিবে লোকটা, তার চেয়ে সেখানে গিয়া আবার বিবাহাদি করিয়া ঘর সংসার করা কি ভাল হইবে না ওর পক্ষে? ময়নাদ্বীপ কি সে রকম আছে এখন, জঙ্গল সাফ হইয়া এখন সেখানে নগর বসিয়াছে।

হোসেন মিয়া চলিয়া গেলে গণেশ ও কুবের বসিয়া অনেকক্ষণ গল্প করিল। ভবিষ্যতের সব জল্পনা-কল্পনা। চাকরি পাইয়া দুজনেই খুশী হইয়াছে, দেনা-পাওয়ার ব্যাপারে হোসেন মিয়া কৃপণ নয়, কোথায় কোথায় যাইতে হইবে, লগি ঠেলা ছাড়া আর কী তাদের দিয়া হোসেন মিয়া করাইয়া লইবে, এখন তাই শুধু তাদের ভাবনা।

কয়েকদিন পরে হোসেন মিয়ার আহ্বান আসিল।

কুবের ও গণেশ সকাল সকাল খাইয়া নদীর ঘাটে গেল। ঘাটে হোসেন মিয়ার বড় একটি পানসি বাঁধা ছিল। নৌকায় আরও দুজন মাঝি আছে, তারাও হিন্দু। হোসেন মিয়ার ব্যবস্থা ভাল, একই নৌকায় হিন্দু-মুসলমান মাঝি থাকিলে তাদের রান্না-খাওয়ার অসুবিধা হয়, সে তই তার তিনটি নৌকার দুটিতে শুধু মুসলমান রাখিয়াছে, আর এই নৌকাটিতে রাখিয়াছে হিন্দু মাঝি। দুজনের নাম শম্ভু ও বগা।

তখন নদীতে কিছু কিছু কুয়াশা ছিল। সকলকে দাঁড় ধরিতে বলিয়া হোসেন নিজে হাল ধরিয়া বসিল। নৌকা চলিল দেবীগঞ্জের দিকে। দেবীগঞ্জে হোসেন নামিয়া গেল। ঘণ্টাখানের পর ফিরিয়া আসিয়া কুবেরকে সে ডাকিল কাছে। বলিল, কলিকাতা হইতে বিড়ি চালান আসিয়াছে, নৌকায় আমিনবাড়ি পৌছাইয়া দিতে হইবে। সেখানে গিরিধারী সাহার গদিতে খবর দিলে তাহারা মাল নামাইয়া লইয়া যাইবে, তারপর কুবের নৌকা লইয়া ফিরিয়া আসিবে কেতুপুরে। দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত নৌকা কেতুপুরেই বাঁধা থাকিবে।

সকলকে সঙ্গে করিয়া হোসেন রেলের মাল গুদামে গেল। টাকা দিয়া মাল খালাস করিয়া আর সে কথা বলিল না, কুবেরের হাতে তিনটি টাকা গিয়া জেটিতে সে স্টীমারটি বাঁধা ছিল সোজাসুজি তাহাতে গিয়া উঠিল।

হোসেন মুখে বলিয়া যায় নাই, কাহারও বুঝিতে বাকি থাকে নাই যে সমস্ত ভার সে দিয়া গিয়াছে কুবেরকে, কুবেরই সব ব্যবস্থা করিবে। কুবের প্রথমটা একেবারে অভিভূত হইয়া গেল। এ কী সম্মান তার, এ কী সৌভাগ্য! এতবড় একটা নৌকা, তিনজন জবরদস্ত মাঝি, তিনশ চারশ টাকার মাল—এ সমস্তের উপর কর্তৃত্বের অধিকার তাহার একার। সকলের রাহা খরচের টাকা পর্যন্ত হোসেন মিয়া তাহার জিম্মা করিয়া দিয়া দিয়াছে।

মাল তুলিতে বলিতে গিয়া কুবেরের মুখে কথা আটকাইয়া গেল। ভয়ে ভয়ে সে একবার সকলের মুখের দিকে চাহিল। হোসেন মিয়ার পক্ষপাতিত্বে না-জানি মনে মনে ওরা কত রাগিয়াছে!

তারপর কুবের নীরবে একটা প্যাকিং কেস তুলিয়া লইল। শম্ভু জিজ্ঞাসা করিল, জলপানি দিবা না কুবির?

কুবের ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, মাল নায় তুইলা দিলে চলব না?

তা চলিবে। ধীরে-সুস্থে তাহারা বিড়ির কেসগুলি নৌকায় তুলিতে লাগিল। কাজে কারো যেন গা নাই। কাজের চেয়ে কথা বলিয়া কুবেরের সঙ্গে খাতির জমাইবার চেষ্টাই তাদের বেশী। একপ্রস্থ মাল রাখিয়া আসিয়াই বগা কুবেরের কাছে একটা বিড়ি দাবি করিয়া বসিল। ওদের দেখাদেখি গণেশও যেন গা ছাড়িয়া দিয়াছে। কুবের মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু মুখে কিছু বলিতে সাহস পাইল না।

মাল বোঝাই হইলে কুবের চিড়া-গুড় কিনিয়া দিল সকলকে, বসিয়া বসিয়া এত আরামে তাহারা চিড়া চিবাইতে লাগিল যেন আজকের মত কাজকর্ম সব শেষ হইয়া গিয়াছে। নৌকা খুলিবার পরেও তাদের শৈথিল্য ঘুচিল না। এমনভাবে দাঁড় টানিতে লাগিল যেন কতকাল আগে তারা মারা গিয়াছে।

কুবের বলিল, গাও লাগাও বাই, জোরে চ্যাপ মার।

শম্ভু বলিল, ক্যান?

কুবের সাহস করিয়া বলিল, ক্যান কী? সারাদিন লাগাইবা আমিনবাড়ি যাওনে? হোসেন মিয়া শুইনা কইব কী?

শম্ভু বলিল, হোসেন মিয়া শুনব ক্যান?

বলিয়া শম্ভু হাসিল। দাঁড় উঁচু করিয়া রাখিয়া বুক চিতাইয়া বলিল, ডরাও নাকি হোসেন মিয়াকে কুবির, আঁই?

কুবেরের পরিচয় এতক্ষণে ওরা পাইয়া গিয়াছে, সর্দার বলিয়া আর মানিবে না, বন্ধুর মত সমানভাবে কথা কহিবে। কুবের বড় বিমর্ষ হইয়া যায়। কত বড় পদটা হোসেন মিয়া তাহাকে দিয়া গিয়াছে ইতিমধ্যে সে তার পদমর্যাদা হারাইয়া বসিল! প্রথম প্রথম যখন ওরা খাতির করিয়া ভাব জমাইবার চেষ্টা করিয়াছিল তখন একটু দূরত্ব বজায় রাখিয়া চলিলে ভাল হইত! গণেশটা পর্যন্ত ওদের সঙ্গে মিলিয়া তার সঙ্গে ইয়ার্কি জুড়িয়া দিয়াছে!

কড়া কথা বলিবে নাকি? ভয় দেখাইবে? ওরা অবশ্যই চটিয়া যাইবে, কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায় তার! স্বয়ং হোসেন মিয়ার সে নির্বাচিত প্রতিনিধি! তবু জোর করিয়া কুবের কিছু বলিতে পারে না।

যেটুকু সে বলে সকলে হাসিয়া উড়াইয়া দেয়, নৌকা অগ্রসর হয় মন্থর গতিতে।

আমিনবাড়ি পৌছিতে বিকাল হইয়া গেল। গিরিধারী সাহার দোকানে খবর দেওয়া হইল বটে কিন্তু সেদিন মাল খালাস করিতে কেহ আসিল না। রাত্রে হোটেলে খাইয়া কুবের নৌকায় শুইয়া রহিল, শম্ভু ও বগার সঙ্গে শহরে গিয়া গণেশ যে কোথায় রাত কাটাইয়া আসিল, সকালবেলা বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াও কিছু জানা গেল না, রহস্য করিয়া তিনজনে তাহারা হাসিতে লাগিল। মনে মনে বড় রাগিয়া গেল কুবের। এ কী তামাসা জুড়িয়াছে গণেশ তার সঙ্গে? আজীবন যে নির্ভরশীল বোকা লোকটা তাহার তোষামদ করিয়া আসিয়াছে, সঙ্গদোষে একদিনে সে এমনভাবে বিগড়াইয়া গেল?

একটু বেলায় দোকানের লোক আসিয়া মাল লইয়া গেল। কুবের অবিলম্বে নৌকা ছাড়িল। কেতুপুরের কাছাকাছি আসিয়া দূর হইতে দেখিতে পাওয়া গেল ঘাটে হোসেন মিয়ার সবচেয়ে

বড় নৌকাটি বাঁধা রহিয়াছে। দেখিয়া কুবেরের মুখ শুকাইয়া গেল। এত দেরি করার জন্য না জানি হোসেন মিয়া তাহাকে কী বলিবে। শম্ভু এবং বগাও হঠাৎ অত্যন্ত বাধ্য ও কর্মঠ হইয়া গেল, ঘাটের কাছে আসিয়া দাঁড় পড়িতে লাগিল ঝপঝপ, গতি বাড়িয়া গেল নৌকার।

হোসেন মিয়া নৌকার সামনে বসিয়া তামাক টানিতেছিল, ছইয়ের মধ্যে জড়সড় বসিয়াছিল একটি নগ্নদেহ বছর চল্লিশ বয়সের পুরুষ, দুটি মাঝবয়সী রমণী ও তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। দেখিয়া মনে হয় একটি মুসলমান পরিবার। কুবের ওদের চিনিতে পারিলে না। হোসেন মিয়ার আত্মীয়-স্বজন যে নয় সহজেই টের পাওয়া যায়, ময়লা ছেঁড়া কাপড় ওদের পরণে, শীর্ণ দেহে শুষ্ক মুখে দারিদ্র্যের সুপরিচিত ছাপ।

ভয়ে ভয়ে কুবের হোসেন মিয়ার দিকে তাকায়, কিন্তু হোসেন মিয়া এতটুকু বিরক্তির লক্ষণ দেখায় না, দাড়িতে হাত বুলাইয়া একবার শুধু জিজ্ঞাসা করে, মাল খালাস দিছ?

কুবের রসিদটা তার হাতে দেয়। তারপর একটাকা দশ আনা ফিরাইয়া দিয়া বলে যে রাহা খরচ বাবদ একটাকা ছ আনা লাগিয়াছে। বলিয়া তাড়াতাড়ি হিসাবও সে দাখিল করিতে আরম্ভ করে। বেশী নয়, তিনটি টাকা হইতে দু আনা পয়সা মোটে সে চুরি করিয়াছে, তবু বুকের মধ্যে তাহার টিপটিপ করিতে থাকে। হোসেন মৃদু-মৃদু হাসে, বলে রও বাই, হিসাব দিবানে পরে।

সেদিন ছুটি।

পরদিন আবার পাড়ি দিতে হইবে।

এবার কাছাকাছি কোথাও নয়, একেবারে সেই চাঁদপুর ছাড়াইয়া মেঘনার মোহনার দিকে। গন্তব্য স্থানটি ঠিক কোথায় হোসেন ভাঙিয়া বলিল না। কুবেরের প্রশ্নে মৃদু মৃদু হাসিয়া জবাব দিল, ব্যস্ততা কিসের! চাঁদপুর গিয়া কুবের নোঙর ফেলুক, ঠিক সময় সেখানে হাজির হইয়া হোসেন স্বয়ং নৌকার ভার নিবে, বলিয়া দিবে কোন পথে চলিবে নৌকা, কোথায় গিয়া শেষ হইবে যাত্রার।

এবার মাল নয়, মানুষ যাত্রা। হোসেনের নৌকায় যে মুসলমান পরিবারটি আসিয়াছে, তাহারা।

কুবের ও গণেশ কতদিনে বাড়ি ফিরিতে পারিবে বলা যায় না। বাড়িতে খরচ দিয়া যাওয়ার জন্য হোসেন দুজনকে পাঁচটি করিয়া টাকা দিল।

বাড়ির পথে গণেশের সঙ্গে কুবের কথা বলিল না। বড় সে চটিয়াছে গণেশের উপর। গণেশ সঙ্গে সঙ্গে চলে, একথা সেকথা বলে, কুবের নীরব হইয়া থাকে, মুখ ফিরাইয়া চাহিয়াও দেখে না। গণেশের কিনা মোটা বুদ্ধি, কুবের যে রাগিয়াছে এটা সে টের পাইল একেবারে বাড়ির কাছাকাছি গিয়া।

টের পাইবামাত্র সে বিবর্ণ হইয়া বলিল, গোসা করছ নাকি কুবিরদা?

কুবের বলিল, যা যা বাড়িত যা, বাজে বকস ক্যান?

বলিয়া সে হন হন করিয়া আগাইয়া গেল। গণেশ ক্ষুধার তাড়নায় তখনকার মত বাড়ি গেল বটে, ভাতটি খাইয়াই সে আবার হাজির হইল কুবেরের বাড়িতে। কুবের কথা কয় না, চাহিয়া দেখে না। গণেশ ভাবিয়া চিন্তিয়া তামাক সাজিয়া নিজে দুটো একটা টান দিয়াই কুবেরের দিকে বাড়াইয়া দিল, বলিল, ধর কুবিরদা।

কুবের হুঁকা গ্রহণ করিল। তবু সে কথা বলিল না।

বিপদে পড়িয়া গণেশ প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, কিবা কর কুবিরদা আঁই? যামু গিয়া কইলাম, আর আমু না।

তখন তাহাকে ক্ষমা করিয়া কুবের জিজ্ঞাসা করিল, কাইল রাইতে ছিলি কই?

প্রশ্ন শুনিয়া গণেশ হাসিয়া ফেলিল, ফিসফিস করিয়া বলিল, ব্যাক্য মাইয়া কুবিরদা, কিবা গীত কয়?

বলিয়া সে গুন গুন করিয়া গান ধরিল—

পিরীত কইরা জ্বইলা মলাম সই, আ লো সই!
আগুন যাওন সমাস সোনার, জউলা চুকা দৈ!
আ লো সই।
থাকলি ঘরে ছ্যাচন কেমন, ঢেঁকির তলে চিড়া যেমন,
বিদেশ গেলি, মনের পোড়ন ভাইজা করে খৈ।
আ লো সই!

কুবের বলিল, দূর দূর লক্ষীছাড়া, কুচরিত্তির হইছস, অঁই? ক্যান গেছিলি?

গণেশ প্রতিবাদ করিয়া বলিল, কুচরিত্তির কিবা? গীত শোননে দোষ নাই।

ঠিক বেড়ার আড়ালে মালা বুঝি শুনিতেছিল, ডাকিয়া বলিল, আবার কও গীতখানা—শুনছ মাঝি? আবার কও।

কুবের ধমক দিয়া বলিল, চুপ থাক, গীত শুইনা কাম নাই।

খানিক পরে চাঁদপুর যাত্রার কথা উঠিল। আড়াল ছাড়িয়া হাতের ভরে ঘষিয়া ঘষিয়া অনুমান করিতে কারো বাকি থাকে নাই, কে জানে কোন গ্রাম হইতে ওদের হোসেন সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। কেহ কুপরামর্শ দিবে ভাবিয়া নৌকা হইতে ওদের সে গ্রামে নামিতে পর্যন্ত দেয় নাই। মানুষটি সহজ নয় হোসেন মিয়া! মরুক তাদের কী? তারা মাঝি, পয়সা দিয়া যে লগি ঠেলিতে বলিবে তারই হুকুম মানিয়া নৌকা ভাসাইবে পদ্মায়, মানুষ না মাল কী আছে নৌকায়, তাহাদের ভাবিবার প্রয়োজন নাই।

বিকাশের দিকে গণেশের খোঁজে উলুপী আসিল, বলিল, যুগল আসিয়াছে। কী খবর যুগলের? সাতদিন পরে তাহার বিবাহ। চার কুড়ি টাকা পণ দিয়া সোনাখালির রূপসী কন্যাকে সে ঘরে আনিতেছে।

ভাল কথা। আসুক। কুবেরের কী? আশ্বিনের ঝড়ে সব আশা-ভরসা তাহার উড়িয়া গিয়াছে। চার কুড়ি টাকার ভাগ্যই যদি তার থাকিবে, পরের নৌকায় মাছ ধরিয়া লগি ঠেলিয়া সে মরিবে কেন আজীবন!

উলুপী আপসোস করিয়া বলে যে কপাল গোপীর! একটা বছর সবুর সহিল না মেয়ের, ঠ্যাং ভাঙিয়া খোঁড়া হইয়া রহিল। কত পাপ করিয়াছিল আর জন্মে কে জানে?

কুবের বলিল, ক্যান যুগইলা বিনা মানুষ নাই দ্যাশে?

উলুপী একটা অদ্ভুত শব্দ করিয়া বলিল, কেডা নিব খোঁড়া মাইয়ারে?

কুবের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে উলুপীর দিকে চাহিল, কিছু বলিল না।

রাত্রে সেদিন হঠাৎ আবার গোপীর হাঁটু ব্যথা করিতে লাগিল। মেয়ে কি সহজে নিষ্কৃতি দিবে সকলকে! ওর যে কুক্ষণে জন্ম হইয়াছিল। ভোর-ভোর কুবের যখন বাড়ির বাহির হইল, গোপী যাতনায় কাঁদিতেছে। বসিয়া থাকিবার উপায় কুবেরের ছিল না। বেলা হইলে তামাকপাতা আনিয়া গোপীর হাঁটুতে জড়াইয়া বাঁধিয়া দিতে বলিয়া, পথে গণেশকে হাঁক দিয়া বিরস চিত্তে সে নদীতীরে গেল।

তখনও হোসেন ঘাটে আসে নাই। শম্ভু ও বগা সদ্য ঘুম হইতে উঠিয়া হাই তুলিতেছে! ছই-এর মধ্যে মুসলমান পরিবারটি তেমনি জগসড় হইয়া বসিয়া আছে। রাত্রে কি ওরা ঘুমায় নাই? আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়া বসিয়া আর একজন কে বসিয়া আছে নৌকায়, কাপড়ের পুঁটুলিটা রাখিতে নৌকায় উঠিয়া কুবের তাহাকে চিনিতে পারিল। আমিনুদ্দি।

আমাগো লগে যাইবা নাকি আমিনুদ্দি বাই? কুবের জিজ্ঞাসা করিল।

হ!

মাইয়া কান্দে না?

আমিনুদ্দি সায় দিল, হ। কান্দে।

দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হইবে, নৌকার দড়ি কাছি লগি ও দাঁড়গুলি কুবের পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তক্তা তুলিয়া ভিতরে কতখানি জল উঠিয়াছে মাপিল। কিছু জ্বালানি কাঠ, তামাক ও নারকেলের ছোবড়া, চাল, ডাল, তেল, নুন, পিতলের দুটা লোহার কড়াই, কয়েকখানা কাঁসি কাল সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছিল, এ সমস্তের তদারকও কুবের করিল। কুবেরের দায়িত্ব কি কম? এত বড় অভিযানের সে পরিচালক।

তদারক শেষ করিয়া কুবের আসিয়া একটা বিড়ি ধরাইল, লক্ষ্য করিতে লাগিল ছই-এর ভিতরের পরিবারটিকে। কী মন-মরাই ওদের দেখাইতেছে সকালবেলার ম্লান আলোকে! কারো মুখে কথা নাই, কী যেন ভাবিতেছে সকলে, ভীত ও স্তব্ধ ছেলেমেয়েগুলির পর্যন্ত এতটুকু সাড়া নাই জীবনের! গ্রাম ছাড়িয়া দেশ ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ যাত্রার গভীর বিষাদ ওদের আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে।

খানিক দেখিয়া কুবের পুরুষটিকে জিজ্ঞাসা করিল, নাম কি মিয়া?

সে মৃদুস্বরে বলিল, রসুল।

বাড়ি কই?

মালুর চর।

কথা বলিতে তাহার ভাল লাগিতেছে না বুঝিতে পারিয়া কুবের চুপ করিয়া গেল।

হোসেন মিয়া আসিতে আসিতে চারিদিক আলো হইয়া উঠিল। ততক্ষণে জেলেপাড়ার অনেকে ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, উলুপী আসিয়াছে কলসী কাঁখে, স্বামীকে বিদায় দিয়া সে কলসী ভরিয়া বাড়ি ফিরিবে। লখা ও চণ্ডী আসিয়াই কুবেরের কাছে একটি করিয়া পয়সা দাবি করিয়াছিল, না পাইয়া তাহারা প্রত্যাশ্যা করে নাই। রাসু যখন গ্রামে রহিল, বাড়ির জন্য কিসের ভাবনা কুবেরের?

এবার নৌকা খুলিলেই হয়। কুবেরের পথ-খরচের জন্য টাকা দিয়া হোসেন নামিয়া গেল। টাকার পরিমাণটা কুবেরকে অবাক করিয়া দিল—কী দরাজ হাত হোসেন মিয়ার। ভয়ও কুবেরের হইল বৈকি? অতগুলি টাকা সামলাইয়া রাখা, হিসেব করিয়া খরচ করা, সে বড় সহজ কর্মভোগ নয়। সবচেয়ে অস্বস্তির কথা, টাকাটা হাতে আসিবামাত্র তাহার ভাবিতে ইচ্ছা হইতেছে, তিন টাকায় যদি দু আনা বাঁচানো যায় নিজের জন্য, চেষ্টা করিলে এতগুলি টাকা হইতে না-জানি কত বাঁচানো চলে! কাল হইতে এই কথাই সে থাকিয়া থাকিয়া ভাবিতেছিল বটে, ভাবিতেছিল কত টাকা হোসেন এবার হাতে দিবে— পথ-খরচের টাকাটা অন্য কারো জিম্মায় হোসেন এবার দিবে কিনা এ আশঙ্কাও তার ছিল না এমন নয়। আজ, টাকাটা পাইয়া সে খানিকক্ষণ অভিভূত হইয়া রহিল। এতখানি বিশ্বাস হোসেন তাহাকে করে? হোসেন মিয়ার মত মানুষকে ফাঁকি দিতে পারিয়াছে ভাবিয়া একটু গর্বও কুবেরের হয়। না লোকটা সর্বশক্তিমান নয়।

কুবের তো জানিত না যে তিন টাকায় দুই আনার বেশী ফাঁকি দিবার সাহস তাহার নাই বলিয়াই হোসেন তাকে বিশ্বাস করে! কুবের পাঁচটা টাকা কোনদিন চুরি করিতে পারিবে না। শুধু সাহসের অভাবে নয়, দু আনার বেলায় যে বিবেক তাহার চুপ করিয়া থাকে পাঁচ টাকার বেলাই তাহাই গর্জন করিয়া উঠিবে।

টাকাগুলি কোমরে বাঁধিয়া কুবের লখা ও চণ্ডীর দিকে চাহিল! তারপর দুটা পয়সা ছুঁড়িয়া দিল ছেলেদের দিকে। পয়সা দুটা কুড়াইয়া নিয়া দুজনে চোখের পলকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এমন সময় দেখা গেল আলুথালু বেশে একটি মেয়ে ঘাটের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। নৌকার উপর আমিনুদ্দি চঞ্চল হইয়া উঠিল। হোসেন বলিল, নাও খোলো কুবির।

খোঁটা হইতে নৌকার দড়ি খুলিয়া শম্ভু হাতে ধরিয়া রাখিয়াছিল। সে লাফাইয়া নৌকায়

উঠিয়া পড়িল। আমিনুদ্দিন মেয়ে যখন ঘাটে একেবারে জলের কিনারা পর্যন্ত আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, নৌকা তফাতে সরিয়া গিয়াছে। বাপজান, বাপজান বলিয়া আকুল হইয়া মেয়েটা কাঁদিয়া লাগিল, নদীতে বুঝি সে ঝাঁপই দিয়া বসে। উলুপী ছাড়া ঘাটে কোন স্ত্রীলোক নাই যে ওকে ধরিবে। উলুপী কলসী-কাঁখে জল নিতে আসিয়াছে, আমিনুদ্দিন মেয়েকে তাহার ছুঁইবার উপায় নাই। কিন্তু এখন সে-কথা ভাবিবার সময় নয়। সে-ই মেয়েটাকে জড়াইয়া ধরিয়া রাখিল। আমিনুদ্দি হাঁকিয়া হাঁকিয়া মেয়েকে বলিতে লাগিল সে ফিরিয়া আসিবে, দুদিন পরে নিশ্চয় ফিরিয়া আসিবে।

মৃদু-মৃদু বাতাস বহিতেছিল। শম্ভু ও বগা বাদাম তুলিয়া দিল। তারপর কেতুপুরের ঘাট দূর হইতে সরিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। কুবের অমিনুদ্দির কাছে আসিয়া বলিল, মাইয়ারে কইয়া আস নাই?

দাঁড় বাহিবার প্রয়োজন ছিল না, আস্তে আস্তে বাতাসের জোর বাড়িয়াছে বাদাম উঠিয়াছে ফুলিয়া। কুবের এবারে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া নিজের রাজ্যপাট ও প্রজাপুঞ্জের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। রাজ্য প্রকাণ্ড, বসিবার শুইবার, স্থানাভাব নাই, শুধু প্রজারা বড়ই অসুখী। মাঝবয়সী রমণীটি, পরিচয় পাইয়া কুবের জানিতে পারিল রসুলের সে বোন, যাত্রার আগেই মৃদুস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কত গ্রাম তাহারা পার হইয়া আসিয়াছে, এখনো থাকিয়া থাকিয়া সে চোখ মুছিতেছে।

বেলা বাড়িতে লাগিল। কুবের সকলকে জলখাবার বণ্টন করিয়া দিল। বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় মনটা খারাপ হইয়াছিল, এখন মন্দ লাগিতেছে না কুবেরের। নদীকে সে বড় ভালবাসে, নদীর বুকে ভাসিয়া চলার মত সুখ আর নাই। একে একে কতগুলি লঞ্চ ও স্টীমার দুদিক হইতে ঢেউ তুলিয়া আগাইয়া যায়, সম্মুখে বোঝাই নৌকাগুলি পড়ে পিছনে। কোথাও নদীর একটি ছাড়া তটরেখা নাই, কোথাও অপর তীরের গাছপালা অস্পষ্ট চোখে পড়ে। কাউয়াচিলা পাখিগুলি ক্রমাগত জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। বকেরা এখন একক শিকারী সন্ধ্যায় ঝাঁক বাঁধিবে। স্টীমার, নৌকা, ভাসমান কচুরিপানা, আকাশের পাখি ও মেঘ ভাসিয়া চলিয়াছে— তীরের দিকে চাহিয়া মনে হয় জলের সীমায় মাটির তীরভূমিও বুঝি লঘুগতিতে চলিয়াছে পিছনে।

তবু নদী ছাড়া সবই বাহুল্য। আকাশের রঙীন মেঘ ও ভাসমান পাখি, ভাঙন-ধরা তীরে শুভ্র কাশ ও শ্যামল তনু, নদীর বুকে জীবনের সঞ্চালন, এসব কিছুই যদি না থাকে, শুধু এই বিশাল একাভিমুখী জল-স্রোতকে পদ্মার মাঝি ভালবাসিবে সারাজীবন। মানবী প্রিয়ার যৌবন চলিয়া যায়, পদ্মা তো চিরযৌবনা। বৈচিত্র্য? কী তার প্রয়োজন? নতুন পৃথিবী কে খোঁজে, কে চায় পদ্মার রূপের পরিবর্তন, শুধু ভাসিয়া চলার অতিরিক্ত মোহ?

সকালবেলা সু-বাতাস ছিল, তারপর বাতাস দিক পরিবর্তন করিল। বিশেষ কিছু অসুবিধা তাহাতে হইল না! দাঁড় টানিতে কোন কষ্ট নাই। নদীর স্রোতেই নৌকা ঠেলিয়া নিয়া চলিয়াছে, ফিরিবার সময় উজান ঠেলিয়া আসিতে প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে বটে, এখন আরামের অন্ত নাই।

মধ্যাহ্নে নৌকা ভিড়াইয়া রান্নার আয়োজন করা হইল। দুটি উনান খুঁড়িয়া দুইটি হাঁড়িতে চাপানো হইল ভাত, কাছের এক গ্রামে তরিতরকারি মিলিল। নিজেদের জন্য রাঁধিবার ভারটা কুবেরের উপরেই পড়িয়াছিল, অদূরে রন্ধনরতা রসুলের বোন নছিবনকে দেখিতে দেখিতে কুবের মনে মনে একটু আপসোস করিল। ভাবিল, কি ক্ষতি মুসলমানের রান্না খাইলে? ডাঙার গ্রামে যাহারা মাটি ছানিয়া জীবিকা অর্জন করে তাহাদের ধর্মের পার্থক্য থাক, পদ্মানদীর মাঝিরা সকলে একধর্মী। গণেশ শম্ভু ও বগা সঙ্গে না থাকিলে কুবের তো নিজের জন্য রাঁধিতে বসিত না।

খাওয়া-দাওয়ার পর আবার নৌকা চলিল। রাত্রি নটা-দশটার সময় একেবারে নদীর

কিনারায় সুষুপ্ত একখানি গ্রামের পাশে সেদিনকার মত স্থগিত করা হইল যাত্রা।

তৃতীয় দিন অপরাহ্নে পাওয়া গেল পদ্মা ও মেঘনার সঙ্গম। নদী এখানে সাগরের মতই প্যারাপারহীন। সন্ধ্যার দেরী নাই দেখিয়া কুবের সেদিন নৌকা বাঁধিল, এদিকে সে আগেও আসিয়াছে বটে কিন্তু নদী ভাল করিয়া চেনা নয়, সন্ধ্যার পর নৌকা চালাইতে সে সাহস করিল না।

পরদিন চাঁদপুরে নৌকা ভিড়িল।

ভালয় ভালয় এতখানি পথ আসিয়া কুবেরের মনে আনন্দ ধরে না। এবার হোসেন মিয়া আসিয়া পড়িলেই সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারে। জাহাজ-ঘাটে স্টীমার ভিড়িলে কুবের গিয়া যাত্রীদের অবরোহণ পথটির মুখে দাঁড়াইয়া থাকে। মোটঘাট লইয়া দেশ-বিদেশের কত নরনারী তাহার সামনে দিয়া রেল-স্টেশনের দিকে চলিয়া যায়, কুবেরের উৎসুক দৃষ্টি অনুসন্ধান করে হোসেনকে। সমস্ত যাত্রী নামিয়া আসিবার পরেও সে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকে।

হোসেন আসিল তিনদিন পরে রাত্রের স্টীমারে।

প্রতীক্ষা করিতে করিতে কুবের চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, হোসেনকে দেখিবামাত্র সমস্ত চাঞ্চল্য তাহার অন্তর্হিত হইয়া গেল। নির্ভয় নিশ্চিন্ত রহস্যময় সদানন্দ মানুষটির সাহচর্যে মুহূর্তে সকল উত্তেজনা জুড়াইয়া যায়—কঠিন কর্তব্য সম্পন্ন করার গর্ব, আগামী কর্তব্য সম্পাদনের দুর্ভাবনা, কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। ভালয় ভালয় কুবের চাঁদপুর আসিয়া পৌছিতে না পারিলেও কিছুই আসিয়া যাইত না বটে হোসেনের!— মৃদু হাসিয়া সে বলিত দরিয়ায় ডুবাইয়া আইছ নাও? ভালা করছ কুবির বাই।

হোসেন নৌকায় আসিয়া বসিল। সকলে তাহাকে ঘিরিয়া রহিল, ছই-এর মধ্যে নছিবন ও রসুলের স্ত্রী ঘোমটার ভিতর হইতে চাহিতে লাগিল— হোসেনকে দেখিয়াই তাহারা ঘোমটা দিয়াছে।

মৃদু মৃদু হাসে হোসেন, সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করে, দাড়ি মুঠা করিয়া ধরিয়া সকৌতুকে রসুলের ছ-বছরের মেয়েটাকে বিবিজান বলিয়া ডাকে। আমিনুদ্দি মেয়ের খবর জিজ্ঞাসা করিলে বলে তাহাকে সে বহাল তবিয়তে ঘরের কাজ করিতে দেখিয়া আসিয়াছে দুশমন বলিয়া গাল দিয়া সে নাকি কড়া কথা বলিয়াছে অনেক।

আমিনুদ্দির চোখ ছলছল করে। সে বলে, আল্লা জানে মিয়া, আর ফির‍্যা আমু না ভাবলি মনডা পোড়ায়।

হোসেন বলে, ফিরনের মন থাকলি কও মিয়া অখন, জাহাজে তুইল্যা দিই তোমারে কাইল। খুশ না হলি ক্যান যাবা?

আমিনুদ্দি মাথা নাড়ে।

হোসেন বলে তবে কাইল তোমাগো নিকা সারি?

আমিনুদ্দি বিস্মিত হইয়া বলে, কাইল ক্যান? ময়নাদ্বীপি দিবা— দুই মাস বাদ।

হোসেন বলে, ময়নাদ্বীপে মোল্লা পামু কই? রাজবাড়ির আজিজ ছাহাব কন, ময়নাদ্বীপি শওজনা মানুষ হলি আর মসজিদ দিলি আর হিঁদুরে জমিন না দিলি গিয়া থাকিত পারেন। তা পারুম না মিয়া। হিঁদু না নিলি মানুষ পামু কই? হিঁদু নিলি মসজিদ দিমু না। ক্যামনে দিমু কও? মুসলমানে মসজিদ দিলি, হিঁদু দিব ঠাহুর ঘর—না মিয়া, আমার দ্বীপির মদ্যি ও কাম চলব না।

সকলে অভিভূত হইয়া শোনে। হোসেনের মুখে ময়নাদ্বীপের কথা কুবের কখনো শোনে নাই, আজ হোসেন বলিতে থাকে ও দ্বীপটির জন্য তার কত দরদ। নীলামে দ্বীপটি কিনিবার পর ওখানে জনপদ বসানোর স্বপ্ন দেখিতেছে সে, জীবনে আর তার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য নাই, কামনা নাই— হাজার দেড়েক মানুষ চলাফেরা করিতেছে, এক বিঘা জমিও দ্বীপের কোনখানে অকর্ষিত নাই, মরিবার আগে এইটুকু শুধু সে দেখিয়া যাইতে চায়। কত অর্থ ও সময় সে ব্যয় করিয়াছে দ্বীপের পিছনে! ময়নাদ্বীপের নেশা পাইয়া না বসিলে আজ তো সে

বড়লোক— একসঙ্গে তাহার এতগুলি লাভবান ব্যবসা দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে ভাবিতে বসিলে আল্লার করুণায় পরিচয়ে মাথা নত হইয়া আসে। হ্, ময়নাদ্বীপ ব্যাপিয়া একদিন মানুষের জীবনের প্রবাহ বহিবে বলিয়া সে কাজে হোসেন হাত দেয় সেই কাজ খোদাতালা সফল করিয়া দেয়। টাকা না থাকিলে সে পারিবে কেন এই কঠিন কাজ সম্পন্ন করিতে?

কী কও রসুল, নিকা সারি কাইল?

রসুল সায় দিয়া বলে, আমি কি কমু মিয়া, যা মন লয় করেন।

হোসেন বলে, বইন কী কয় জিগাও।

রসুল ছই-এর মধ্যে গিয়া খানিক পরামর্শ করিয়া আসে। নছিবনের মত আছে। আমিনুদ্দি নিঃশব্দে বসিয়া থাকে। আপন মনে কী যেন ভাবিতে থাকে বন্দরের আলোক-মালার দিকে চাহিয়া। কুবের সবিস্ময়ে হোসের প্রত্যেকটি ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করে। কী প্রতিভা লোকটার, কী মনে জোর! যেখানে যত ভাঙাচোরা মানুষ পায় কুড়াইয়া নিয়া জোড়াতালি দিয়া নিজের দ্বীপে রাজ্য স্থাপন করিতেছে— প্রজাবৃদ্ধির ব্যবস্থার দিকে তাহার সজাগ দৃষ্টি। হোসেনের উদ্দেশ্যই হয়তো তাই, আমিনুদ্দিন মত জীবন-যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হতাশ ও নিরুৎসাহ মানুষগুলিকে আসলে তাহার প্রয়োজন নাই, ওরা তাহার দ্বীপটি যে নবীন নরনারীতে ভরিয়া দিবে, সে তাহাদের প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

অনেক রাত্রে হোসেন বিদায় গ্রহণ করিল। নৌকায় তখন জল্পনা-কল্পনার অন্ত রহিল না। প্রথম বিস্ময়টা কাটিয়া যাওয়ার পর আমিনুদ্দির সঙ্গে সকলে হাস্য-পরিহাস জুড়িয়া দিল। ঠাট্টা করিতে বড় মজবুত শম্ভু। তার এক-একটা কথায় নৌকায় হাসির কলরব উঠিতে লাগিল, ছই-এর মধ্যে রমণী দুটি পর্যন্ত মাঝে মাঝে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া মুখে কাপড় চাপা দিতে লাগিল!

পরদিন আমিনুদ্দিন সঙ্গে নছিবনের নিকা হইয়া গেল। তার পরের দিন কতগুলি চাষের যন্ত্রপাতি, তিন-চার বস্তা আলু, এক পিপা সরিষার তৈল, কাঠের একটা বাক্স-বোঝাই নুন, কতকগুলি সস্তা বিলাতী কম্বল, একবস্তা কাপড় জামা, এইসব অজস্র জিনিসপত্রে হোসেন নৌকা বোঝাই করিয়া ফেলিল।

রাত্রি প্রভাত হইলে বলিল, নাও খোলো কুবির বাই।

কোন্ দিক যামু মিয়া বাই।

হোসেন বলিল, সমুন্দুর!

সারাদিন এই তীর ঘেঁষিয়া নৌকা চলিল। কেতুপুরে পদ্মায় যে নৌকাকে অত্যন্ত বৃহৎ মনে হইয়াছিল, এখন সেটিকে কুবেরের মোচার খোলা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। পরদিন অপরাহ্ণে নোয়াখালি জেলার নারিকেলবৃক্ষপূর্ণ তীর-ভূমিতে নৌকা বাঁধা হইল। এদিকে কখনো আসে নাই, বিস্ময়ের সঙ্গে হোসেনকে জিজ্ঞাসা করিল, এই কি সমুন্দুর? হোসেন একখানা ম্যাপ বাহির করিল। আঙুল দিয়া সে কুবেরকে চিনাইয়া দিতে লাগিল মেঘনার মোহনার দ্বীপগুলি— সিদ্ধিদ্বীপ, বিদৌদ্বীপ, সন্দীপ, হাতিয়া প্রভৃতি। আরও পশ্চিমে মানপুরদ্বীপ, দক্ষিণ শাবাজপুর বন্দোরাদ্বীপ। আর ওই যে ছোট ছোট বিন্দুগুলি দেখা যায় বাইশ নম্বর মোটা লাইনটার উপর, ওগুলি মানিক-দ্বীপপুঞ্জ। চিনিতে পারিতেছে কুবের। আর ওই পূর্ব-পশ্চিমের বাইশ নম্বর লাইন আর উত্তর-দক্ষিণের একানব্বই নম্বর লাইনটা যে বিন্দুতে পরস্পরকে অতিক্রম করিয়াছে, এই বিন্দুটার কিছু উত্তর উত্তর-পূর্বে ওই যে একটি সবুজ বিন্দু দেখা যায়, ওর নাম ময়নাদ্বীপ। আর ঘণ্টাদশেক নৌকা বাহিয়া তাহারা নোয়াখালির তীর-ভূমিকে পিছনে ফেলিবে, তারপর হাতিয়া ডাইনে রাখিয়া ধনমানিকদ্বীপ ছুঁইয়া, ধনমানিকদ্বীপ আর বাবনাবাদ দ্বীপের যোগরেখার সঙ্গে বিয়াল্লিশ ডিগ্রী কোণ করিয়া পূর্ব-দক্ষিণে নৌকা বাহিয়া একদিনে ময়নাদ্বীপ পৌঁছানো যাইবে।

কুবের ভাল বুঝিতে পারে। হাঁ করিয়া নকসার-রেখা ও লেখাগুলির দিকে চাহিয়া থাকে। কে জানে ওর মধ্যে ডাঙ্গা ও জলের পার্থক্য কী কৌশলে আঁকা আছে, সে তো কোন প্রভেদ

বুঝিতে পারে না।

হোসেন মিয়া যে কত বড় দক্ষ নাবিক, দিকচিহ্নহীন সমুদ্রের বুকে তাহার নৌকা পরিচালনা দেখিয়াই বোঝা গেল। সামনে একটা কম্পাস রাখিয়া সে হাল ধরিয়া বসিল, নৌকার ছয়জন মাঝি টানিতে লাগিল দাঁড়। সারাদিন পরে রক্তিম সূর্য সমুদ্রের জলে ডুবিয়া গেল, পূর্বে বহুদূরে কালো বিন্দুর মত একটি দ্বীপ ছাড়া সূর্য শুধু দেখাইয়া গেল আকাশ ও জলরাশি। রাত্রে ও দাঁড় টানার বিরাম হইল না, পালা করিয়া দুজন দুজন মাঝিকে দু-ঘণ্টা করিয়া ঘুমানোর অবসর দিয়া চারজনকে হোসেন সব সময়ে বসাইয়া রাখিল দাঁড়ে, নিজে এক মিনিটের জন্যও চোখ বুজিল না। নৌকার সকলে হয়রান হইয়া গেল, কুবেরের মনে হইতে লাগিল নৌকা বাহিয়া জীবনে সে আর কোনদিন এত শ্রান্ত হইয়া পড়ে নাই।

সকালবেলা দেখা গেল চারিদিক নিবিড় কুয়াশায় ঢাকিয়া গিয়াছে।

হোসেন বলিল, বৈঠা থোও কুবির, নোঙর ফেলো।

এতখানি কাছি টানিয়া নোঙর সমুদ্রের তলে গিয়া ঠেকিল যে কুবেরের মনে হইল নোঙরটা পাতালে পৌঁছিয়াছে। কুয়াশায় নৌকা চালাইবার উপায় নাই, ধনমানিক দ্বীপের কাছাকাছি তাহার আসিয়া পড়িয়াছে, কুয়াশায় দেখিতে না পাইয়া পাশ কাটাইয়া দূরে চলিয়া গেলে বিপদ হইবে। এই দ্বীপটির অবস্থান দেখিয়া তবে ঠিক করা যাইবে বাবনাবাদ দ্বীপের সঙ্গে ইহার যোগরেখা, তারপর সোজা আগানো চলিবে কম্পাসের উপর নির্ভর করিয়া একেবারে ময়নাদ্বীপের দিকে। সারাদিন নৌকার অবস্থান বুঝিতে পারা যাইবে কিনা সন্দেহ। অপেক্ষা করিতে হইবে রাত্রির জন্য। রাতে তারা উঠিলে ওই যে অদ্ভুত যন্ত্রটা আছে হোসেনের, ওই যন্ত্রের ভিতর দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া তবে হোসেন বলিতে পারিবে কোনদিকে কতদূরে ধনমানিক দ্বীপ লুকাইয়া আছে।

কী জান মিয়া, কলের জাহাজ হলি, জানন যায় কত জোর চলতেছি, ঘন্টায় কত মাইল আলাম— সমুন্দুরের কোনখানে রইছি হিসাব করলি মেলে। নাও চালাইয়া জানুম কিবা? দাড়িতে হাত বুলায় হোসেন, সকলকে অভয় দিয়া আবার বলে, ডরাইও না দশ বাজলি কুয়াশা থাকব না। আইজ-কাইল রোজ বিহান-বেলা কুয়াশা হয়। অ্যারে কি কুয়াশা কয় মাঝি?

বসিয়া বসিয়া হোসেন গল্প বলে, সকলে শোনে! এ যেন কেতুপুরের এক ভাঙ্গা কুটিরে হোসেনের আড্ডা বসিয়াছে। এমনি কুয়াশার মধ্যে একবার সে সমুদ্রের বুকে হারাইয়া গিয়াছিল, তিন দিন নোঙর ফেলিয়াছিল, সমুদ্রে, জল ফুরাইয়া গিয়া শেষের দিন তৃষ্ণার ছাতি তাহাদের ফাটিয়া গিয়াছিল। তারপর হোসেন কম্পাস কিনিয়াছে, তারা দেখিয়া নৌকার অবস্থান নির্ণয়ের যন্ত্র কিনিয়াছে, চাটগাঁয়ে হোসেন যখন জাহাজে কাজ করিত, খালাসীর কাজ করিতে করিতে শেষ পর্যন্ত একটা মালবাহী স্টীমারের বো'সান পর্যন্ত সে হইয়াছিল, সেই সময় এক সাহেব কাপ্তেনের কাছে এসব যন্ত্রের ব্যবহার শিখিয়াছে। বড় বড় জাহাজ চালাইয়া হোসেন পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে পারে!

পৃথিবী সে কি ঘুরিয়া আসে নাই? হ্যা, সে কাহিনী বলিবার মত বটে। কুড়ি বছর বয়সে হোসেন বাড়ি ছাড়িয়া পালাইয়াছিল, তারপর অর্ধেক জীবন সে তো দেশ-বিদেশে ঘুরিয়াই কাটাইয়াছে— নদীর বুকে ও সমুদ্রে।

অনেক বেলায় আস্তে আস্তে কুয়াশা মিলাইয়া গেল। নোঙর তোলা হইল। দুঘণ্টা পরে দূরে দেখা গেল ধনমানিক দ্বীপ। কম্পাসটা সামনে রাখিয়া হোসেন হাল ধরিয়া বসিল, পরদিন ভোরবেলা তাহারা ময়নাদ্বীপ পৌঁছিয়া নোঙর ফেলিল!

এই ময়নাদ্বীপ? পাঁচ-ছয় বৎসর ধরিয়া যে রহস্য-নিকেতনের কথা শুনিয়া আসিয়াছে? কুবের যেন একটিমাত্র দৃষ্টিপাতে দ্বীপটিকে দেখিয়া ফেলিতে চায়। দ্বীপের খানিকটা ডিম্বাকৃতি, খানিকটা ত্রিকোণ। দ্বীপের দীর্ঘতম পরিসর প্রায় এগার মাইল— হোসেন নিজে মাপিয়া দেখিয়াছে। দ্বীপে যেখানে নৌকা ভিড়িয়াছিল, সেদিকে অংশ পরিষ্কার করিয়া বসতি স্থাপিত

হইয়াছে, চাষ হইতেছে, বাকি অংশ জঙ্গলে ঢাকা। পশ্চিম দিকে অসংখ্য নারিকেল গাছ, সমস্ত দ্বীপে ছড়াইয়া না পড়িয়া গাছগুলি একস্থানে ঘন হইয়া মাথা তুলিয়াছে কেন? বোঝা যায় না।

জমি অত্যন্ত নীচু, এত নীচু যে আশঙ্কা হয় যেদিন খুশি হইবে সেইদিনই সমস্ত দ্বীপটিকে সমুদ্র গ্রাস করিয়া ফেলিবে। দ্বীপের মাঝখানে এক মাইল পরিমিত একটা লোনা জলা আছে, সমুদ্রের চেয়েও ওখানটা বুঝি নীচু, খাল কাটিয়া যোগ করিয়া দিলে সমুদ্রের জল আসিয়া ভরিয়া ফেলিবে। জলার ধারে খানিকটা জমি করা হইয়াছে, বিস্ময়কর ফসল ফলে। জলায় ও চারিদিকের জঙ্গলে অসংখ্য সাপ আছে, কিন্তু জন্তু-জানোয়ার কিছু নেই, রাসু যে বাঘ-সিংহের গল্প করিয়াছিল—সেটা নিছক গল্পই।

হোসেন মিয়ার উপনিবেশে লোকসংখ্যা একশর কম নয়, কিন্তু তার তিন ভাগই প্রায় ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, যাদের অধিকাংশই এই দ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ম্যালেরিয়া ও সাপের সঙ্গে লড়াই করিয়া এখনো হোসেন জয়লাভ করিতে পারে নাই, জঙ্গলের সঙ্গে অবিরত সংগ্রাম চলিয়াছে। অনেক খাদ্য এখানে উৎপন্ন করা যায় না, জীবনের অনেক প্রয়োজন মিটাইতে সমুদ্রপথে পাড়ি দিতে হয় সভ্য জগতের দিকে। অবিশ্রাম খাটুনি এখানে, অসংখ্য অসুবিধা এখানে, জীবন এখানে নির্মম ও নীরব। রাসুর মত অনেকে তাই পলাইয়া গিয়াছে। হোসেনের পাঁচ বছরের চেষ্টায় দ্বীপে তাই ত্রিশটির বেশী পরিবার নীড় বাঁধে নাই। আমিনুদ্দি ও রসুলকে ধরিলে দ্বীপে গৃহস্থ পরিবারের সংখ্যা এবার বত্রিশ হইল মাত্র।

কী কঠিন কাজে হোসেন মিয়া যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, কী সীমাহীন যে তাহার ধৈর্য ও অধ্যবসায়, এবার কুবের তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে। এই নীচু জলা ও জঙ্গলপূর্ণ মনুষ্যবাসের অযোগ্য দ্বীপ, ধান ছাড়া আর কোন ফসল যে দ্বীপের লোনা মাটিতে জন্মে না, লাউ-কুমড়াগুলি ফলে কুঁকড়ানো শশার মত ছোট ছোট,— এখানে এই মুষ্টিমেয় নরনারী বসতি স্থাপন করাও হোসেন মিয়া ছাড়া আর কারো দ্বারা সম্ভব হইত না। সন্দীপ, হাতিয়া, ধনমানিক, বাবনাবাদ এইসব জনপূর্ণ দ্বীপের কথা কুবের শুনিয়াছে; ময়নাদ্বীপ যদি মানুষের বাসের যোগ্য হইত, ওই সব দ্বীপের মত কবে এখানে গড়িয়া উঠিত গ্রাম। এ কি কদর্য একটা দ্বীপ হোসেন বাছিয়া লইয়াছে?

হয়তো সস্তায় পাইয়াছিল বলিয়া। স্বাস্থ্যকর, উর্বর দ্বীপ কিনিয়া জমিদারী পত্তনের টাকা হোসেন কোথায় পাইত? ও রকম জনহীন দ্বীপই বা কোথায়?

দ্বীপ দেখিয়া আমিনুদ্দি ও রসুল বড় দমিয়া গিয়াছে। ফিরিয়া যাওয়ার কথাটা তাদের মুখে শোনা গিয়াছে দু-একবার। তবে হোসেনের সামনে তারা কিছুই বলে না। আমিনুদ্দি অপরিশোধ্য আর্থিক ঋণেই শুধু আবদ্ধ নয়, হোসেন না দিলে ও জীবনে স্ত্রী কি আর তাহার জুটিত,— নছিবনের মত স্ত্রী? রসুলকে জেলের দুনিয়া হইতে ছিনাইয়া নিয়ে আসিয়াছে হোসেন, দেশে ফিরিলে জেলেই হয়তো তাহাকে ঢুকিতে হইবে। প্রতিদানে হোসেন আর কিছুই তাদের কাছে চায় না, তারা শুধু এখানে বাস করুক, স্বপ্ন সফল হোক হোসেনের। ইতিমধ্যে তাদের জন্য ঘর উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে, দয়া করিয়া ওই ঘরে তারা নীড় বাঁধিলে কৃতার্থ হইয়া যাইবে হোসেন। জঙ্গল কাটিয়া যত জমি তারা চাষের উপযোগী করিতে পারিবে সব তাদের সম্পত্তি, খাজনা বা চাষের ফসল কিছুই হোসেন দাবী করিবে ন। নিজের জীবিকা তাহারা যতদিন নিজেরাই অর্জন করিতে পারিবে না, জীবিকা পর্যন্ত যোগাইবে হোসেন। গৃহ ও নারী, অন্ন ও বস্ত্র, ভূমি ও স্বত্ব সবই তো পাইলে তুমি, এবার শুধু খাটিবে ও জন্ম দিবে সন্তানের, এটুকু পারিবে না?

হোসেনের কাছে ফিরিয়া যাওয়ার কথা তাই কেহ মুখে আনিতে পারে না। ফিরিয়া যে যায় সে যায় পলাইয়া চুপিচুপি চোরের মত।

হোসেন তাদের ক্ষমা করে। দেখা হইলে রাসুর মত হোসেন তাদের জঙ্গল সাফ করার মজুরী দেয়। জোর-জবরদস্তি হোসেনের নাই, অন্যায় সে কারো প্রতি করে না। শুধু তাকেই হোসেন শাস্তি দেয়, ভীষণ ও মর্মান্তিক, যারা শত্রুতা করে হোসেনের, অকারণে ক্ষতি করিতে চায়, বিঘ্ন জন্মায় হোসেনের স্বপ্ন সফল হইবার পথে।

কদিন কুবের দ্বীপ দেখিয়া ও দ্বীপের মানুষগুলির সঙ্গে ভাব করিয়া কাটাইয়া দিল। ক্ষেতের ধান সব কাটা হইয়া গিয়াছে, কিছু সরিষা, বুট ও মটর লাগানো হইয়াছে, মূলা, পালং, কপি প্রভৃতি শাকসব্জী গত বছর বাঁচিয়া থাকিতে চাহে নাই, এ বছর কয়েক বিঘা জমিতে নূতন এক প্রকার সার দিয়া পরীক্ষার জন্য কিছু কিছু চাষ হইয়াছে, কী হইবে বলা যায় না

আরও ভিতরের দিকে দ্বীপের মাটি রবিশস্যের উপযোগী কিনা দেখিবার জন্য জঙ্গলের মধ্যে এখন অল্প একটু স্থান পরিষ্কার করা হইতেছে। সকালবেলা দা কুড়াল লইয়া একদল লোক জঙ্গলের মধ্যে মাইলখানেক হাঁটিয়া যায়, নির্বাচিত স্থানটিতে গাছপালা ঝোপঝাড় কাটিয়া সাফ করে, শাবল দিয়া খুঁড়িয়া গাছের শিকড় তুলিয়া ফেলে, তারপর সারাদিন মশা ও পোকার কামড়ে শরীর ফুলাইয়া সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসে। কুবের একদিন দেখিতে গিয়া শিহরিয়া ফিরিয়া আসিল। এই দ্বীপটির সৃষ্টির দিন হইতে যে বনভূমি কুমারী, তার বুকের এক খাবলা মাংস যেন সকলে ছিনাইয়া লইয়াছে, চারিপাশে নিবিড় বনের মাঝখানে পরিষ্কৃত স্থানটুকু এমনি বীভৎস দেখায়!

কয়েকদিন আগে কী একটা গোলমাল হইয়াছিল দ্বীপে, হোসেন উপস্থিত না থাকিলে অনেকে একত্র হইয়া জটলা করে, ভাষা-ভাষা দুটো একটা কথা কানে আসে কুবেরের। বিপিন নামে ষাট বছরের এক বৃদ্ধ হোসেন এখানে মোড়ল করিয়াছে, তাকে ঘিরিয়াই জটলাটা জমাট বাঁধে বেশী, কুবের কাছে গেলেই কিন্তু সকলে চুপ করিয়া যায়। তারপর একদিন সন্ধ্যার সময় কাজকর্ম শেষ করিয়া সকলে যখন ঘরে ফিরিয়াছে, নিজের স্বতন্ত্র কুটিরের দাওয়ায় বসিয়া হোসেন প্রসন্ন মুখে টানিতেছে তামাক, বিপিন কথাটা ফাঁস করিল। বলিল, নালিশ আছে একটা।

নালিশ? হোসেনের মুখ গম্ভীর হইয়া গেল।

বিপিন ধীরে ধীরে ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল। নারী-সংক্রান্ত লজ্জাকর ঘটনা! এনায়েত দ্বীপে দ্বীপে আসিয়াছে মাত্র ছামাত্র আগে ইতিমধ্যেই সে সকলকে বড় জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে। প্রথম প্রথম এর সঙ্গে ওর সঙ্গে প্রায় তার কলহ বাধিত, একদিন নিরীহ দুর্বল গগন ঘোষকে মারিয়া সে জখম করিয়া দেয়, সকলে মিলিয়া তখন খুব শাসন বলিয়া দেন এনায়েতকে। তারপর হইতে সে বেশ শান্তশিষ্ট হইয়াই থাকে, ব্যাপারটা তাই হোসেনকে জানানো হয় নাই। কিন্তু কদিন আগে সে এক ভয়ানক অপরাধ করিয়া বসিয়াছে। বসির মিয়ার বৌটি ছেলেমানুষ, কিছুদিন হইতে এনায়েত তাকে নাকি বিরক্ত করিতেছিল, ভয়ে বৌটি কাহাকেও কিছু বলে নাই। তারপর একদিন দুপুরবেলা সকলে যখন কাজে গিয়াছে, এনায়েত বসিরের ঘরে প্রবেশ করে। বসিরের স্ত্রীর চেঁচামেচি শুনিয়া পাশের কুটিরের আকবরের স্ত্রী গিয়া পড়ায় বেচারা সেদিন ভালয় ভালয় রক্ষা পাইয়াছে।

হোসেন বলিল, হারামির পোলারে কাইটা দরিয়ায় দিলা না ক্যান?

বিপিন স্বীকার করিল, অতটা তাহারা করিতে পারে নাই, তবে মারধোর করা হইয়াছে যথেষ্ট। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সকলকে হোসেন ডাকিয়অ আনিতে বলিল, এনায়েতও যেন আসে। অল্পক্ষণের মধ্যে সকলে আসিয়া জুটিল, মেয়েরাও কেহ কেহ আসিয়া তফাতে দাঁড়াইয়া রহিল কৌতুহলের সঙ্গে। বিচার হইবে এনায়েতের। কে জানে তাহাকে শূলেই দিবে, না সাগরে ডুবাইয়া মারিবে হোসেন!

এনায়েতের বয়স বেশী নয়, বলিষ্ঠ যুবক সে ময়নাদ্বীপে এমন আর একটা মানুষও নাই। তেজের সঙ্গে সে আসিয়া হোসেনের সামনে বসিল, নির্ভর নিশ্চিন্ত। হোসেন একে একে দুটো

একটা কথা জিজ্ঞাসা করিল, রুষ্ট চোখে এনায়েতের দিকে চাহিতে লাগিল, বার বার বলিতে লাগিল, কী আপসোস! কী আপসোস!

তারপর সে কৈফিয়ত তলব করিল এনায়েতের।

এনায়েত বলিল, জবরদস্তি করি নাই মিয়া।

হোসেন বলিল, না করলা জবরদস্তি, বসিরের ঘরের মদ্যি যাবা ক্যান তুমি? কবিলারে নজর দিবা ক্যান?

আমারে দেইখ্যা একরোজ স্যায় হাসিল!

আরে বলদা তুমি। বাই বইলা হাসিল, দ্যাশগাঁও ছাইড়া দ্বীপের মদ্যি আইসা রইছ, বাই-বইন না মাইয়া-মরদ অ্যানে? ভাল কাম কর নাই মিয়া। তিন রোজ বাইন্ধা থুমু তোমারে, খনাপিনা মিলব না।

তখন হোসেন মিয়ার হুকুমে সকলে মিলিয়া তাহাকে দাওয়ার খুঁটির সঙ্গে বাঁধিয়া দিল। আলগা করিয়া বাঁধিল, হোসেন মিয়ার হুকুমের চেয়ে দড়ির বাঁধন তো এ দ্বীপে জোরালো নয়। বাঁধন খুলিয়া পালানোর সাহস এনায়েতের হইবে না। কোথায় পালাইবে?

হোসেনের ঘরের কাছেই একখানা ঘরে কুবের ও তাহার সঙ্গীদের থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল। সেদিন অনেক রাত্রে বাহিরে গিয়া জ্যোৎস্নালোকে কুবের দেখিতে পাইল, হোসেনের ঘরের দাওয়ায় বন্দী এনায়েত থালায় ভাত খাইতেছে, কাছে বসিয়া আছে একটি রমণী। চুপি চুপি কুবের ঘুরিয়া হোসেনের ঘরের পিছনের দিকে গেল, জানালা দিয়া আস্তে আস্তে তাহাকে ডাকিয়া তুলিল।

খবর শুনিয়া হোসেন হাই তুলিয়া বলিল, হ? ঘুমাও গা কুবির। আর শোন বাই, কী দেখলা কী শুনলা আঁধার রাতে মনে মনে থুইও, কইয়া কাম নাই।

বলিয়া হোসেন পাশ ফিরিয়া শুইল।

এত বড় একটা ব্যাপারকে অবহেলা করিয়া হোসেনের পাশ ফিরিয়া শোয়া অবাক করিয়া দিল কুবেরকে আজ, ব্যাপার সে বুঝতে পারিল দ্বীপ ছাড়িয়া ফিরিবার দিন। বুড়া বসির নৌকায় আসিয়া উঠিল, তার ছেলে মানুষ বৌ রহিয়া গেল দ্বীপে। বসির এ দ্বীপের আদি বাসিন্দা, প্রায় পাঁচ বছর এখানে সে সস্ত্রীক বাস করিতেছে। ছেলেমেয়ে হয় নাই বসিরের— একটিও নয়। পাঁচ বছরে যে একটিও মানুষ বাড়াইতে পারিল না দ্বীপের, কয়েক বছরের মধ্যে যে প্রবেশ করিবে কবরে, তাকে দিয়া আর কী প্রয়োজন আছে হোসেনের? বসির এবার তলাক দিবে তার বৌকে। তারপর যথাসময়ে এনায়েতের সঙ্গে নিকা হইবে বৌটির। একটি বৌ আছে এনায়েতের, শীঘ্রই সে হোসেনকে উপহার দিবে একটি আনকোরা নতুন মানুষ— ময়নাদ্বীপের এক টুকরা ভবিষ্যৎ। তবুও আরও একটা হোক এনায়েতের, সার্থক হোক দুজনের অন্যায় অসামাজিক প্রেম, পাঁচ বছরে যে রমণী জননী হইতে পায় নাই, তার কোল জুড়িয়া আসুক সন্তান, মানুষ বাড়ুক হোসেনের সাম্রাজ্যে।

গ্রাম ছাড়িবার তিন সপ্তাহ পরে কুবের ও গণেশ গ্রামে ফিরিয়া আসিল। চাঁদপুরে তাহাদের নামাইয়া দিয়া হোসেন নৌকা লইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। হোসেনের মুসলমান মাঝিরা চাঁদপুরে অপেক্ষা করিতেছিল।

গোপীকে নিয়া ইতিমধ্যে অনেক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। কুবের যেদিন চলিয়া গেল সেই দিনই গোপীর পা ভয়ানক ফুলিয়া ওঠে। বাড়িতে পুরুষ কেহ নাই, কী করিবে ভাবিয়া না পাইয়া মালা কাঁদিয়া অস্থির হইয়াছিল। তারপর রাসু আসিয়া সব অবস্থা করিয়াছে। কত যে করিয়াছে রাসু গোপীর জন্য, শত মুখেও মালা তাহা শেষ করিতে পারিবে না। সেই দিনই গোপীকে রাসু আমিনবাড়ির হাসপাতালে নিয়া গিয়াছিল, রাত্রেই গোপীর হাঁটুতে আবার অস্ত্র করা হয়। সে এখনো হাসপাতালে আছে, প্রায়ই রাসু তাহাকে দেখিতে যায়। ডাক্তার আশ্বাস দিয়াছে, হাড় ভাঙ্গিয়া মাংসপেশীর জট ছাড়াইয়া গোপীর হাঁটু এবার ঠিক করিয়া দেওয়া

হইয়াছে, একটু খোঁড়াইলেও হাঁটিতে পারিবে।

কুবের ফিরিয়াছে খবর পাইয়া রাসু আসে। কুবের দুটো-একটা কৃতজ্ঞতার কথা বলিতেই সে একেবারে গলিয়া যায়। মাথাটা একবার চুলকাইয়া রাসু কয়েকটা ঢোক গেলে। তারপর হঠাৎ বলিয়া বসে, গোপীরে দিবা মাঝি আমারে।

কুবের গম্ভীর হইয়া যায়। বলে ব্যস্ততা কিসের? গোপী তো পড়িয়া আছে হাসপাতালে, আগে ফিরিয়া আসুক। রাসু তবু পীড়াপীড়ি করিতে থাকে। গোপীর পা ভাল হইয়া যাইবে শুনিয়া অবধি সে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে, এই সময় কুবেরের কাছে কথা আদায় করিয়া না রাখিলে পরে হয়তো যে মত বদলাইয়া ফেলিবে। গোপীর পঙ্গুতা আরোগ্য হওয়া যখন অনিশ্চিত ছিল তখন কথাটা পাকাপাকি করিয়া নেয় নাই বলিয়া এখন বড় অনুতাপ হইয়াছে রাসুর।

শেষে কুবের বলে, কাইল কমু রাসু।

রাত্রে সে পরমর্শ করিল মালার সঙ্গে। পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যে, রাসু যদি দেড়কুড়ি টাকা পণ দেয় আর দুকুড়ি টাকার গহনা দেয় গোপীকে তবে এ বিবাহ হইতে পারে। তার কমে হইবে না।

পরদিন রাসু আসিল। কুবেরের দাবি শুনিয়া সে ভড়কাইয়া গেল। বলিল, অত টাকা কই পামু?

কুবের তার কী জানে? এই কটা টাকা যদি সে বিবাহে খরচ করিতে না পারে, বিবাহের পর বৌকে তবে সে খাওয়াইবে কোথা হইতে?

রাসু মাথা নীচু করিয়া থাকে। মালা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বুঝি মমতাবোধ করে, কুবেরকে ইশারায় কাছে ডাকিয়া ফিস ফিস করিয়া টাকার পরিমাণটা কিছু কমাইতে বলিয়া দেয়। কিন্তু মেয়েমানুষের পরামর্শে ভুলিবার পাত্র কুবের নয়। গম্ভীর অবিচলিত মুখে সে বসিয়া থাকে বেড়ায় ঠেস দিয়া, চক্ষু মুদিয়া যেন ঘুমাইয়া পড়ে।

অনেকক্ষণ পরে রাসু বলে, আইচ্ছা দিমু।

বলিয়া সে উঠিয়া যাইতে চায় কিন্তু কুবের এবার তাহাকে খাতির করিয়া বসায়, আগ্রহ সহকারে গল্প জুড়িয়া দেয় ময়নাদ্বীপের। রাসুর না জাগে উৎসাহ, না আসে মুখরতা। কী হইল রাসুর? এতদিনের স্বপ্ন তাহার সফল হইবে জানিয়া আহ্লাদ হইল না কেন? তামাক সাজিয়া খানিকক্ষণ টানিয়া হুঁকোটি নামাইয়া রাখিয়া কুবের আড়ালে যায়। কদিন আগেও তাহারা হুঁকা কাড়াকাড়ি করিয়া তামাক টানিয়াছে কিন্তু এখন কিনা রাসু তাহার ভাবী জামাতা, ওর হাতে এখন হুঁকা দেওয়া যায় না, ওর তামাক খাওয়ার সময় সামনে থাকা যায় না।

দিন তিনেক পরে কুবের আমিনবাড়ি গিয়া গোপীকে দেখিয়া আসিল। হাসপাতালে খাবার খাইয়া বিছানায় শুইয়াই গোপী দিব্যি মোটা সোটা হইয়াছে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য রঙের যেন তাহার খোলতাই হইয়াছে বেশ। দিন সাতেক পরে সে ছুটি পাইবে।

রীতিমত শীত পড়িয়াছে এখন। জেলেপাড়ার ছেলেবুড়ার শরীর রুক্ষ হইয়া খড়ি উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। মালার চামড়া কিন্তু চিরদিন মসৃণ, হাজার শীতেও কখনো তাহার গা ফাটে না। কপিলারও বুঝি ফাটে না। যে তেলটাই কপিলা খরচ করে শরীরের পিছনে! মাঠে পালং শাকের পাতাগুলিতে যে সরল লাবণ্য ফুটিয়া আছে, কপিলার দেহে হয়তো তার অভাব নাই। মালার বোন তো সে! মালার চেয়ে সে হাজার গুণে শৌখিন।

কাজ-কর্ম নাই, বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া কুবের সময় কাটায়। পীতম মাঝির অসুখ হইয়াছে, বুড়ো বয়সে তাহার সেবা করিবার কেহ নাই, যুগী তাই আসিয়া বাপের কাছে আছে। পীতম সেবা গ্রহণ করে মেয়ের কিন্তু দিবারাত্রি তাকে গাল দিয়া কিছু রাখে না। যুগীর হাতে জল খাইয়া চিরদিন নরকে পচিবার সাধ যে তাহার নাই, সবসময় এই কথাটা সে ঘোষণা করিতে করিতে গলা কাঠ হইয়া আসিলে যুগীর জল খাইয়াই তৃষ্ণা মেটায়। পীতমের টাকা আছে

অনেক। বলে, টাকার লোভে যুগী তাহার সেবা করিতে আসিয়াছে কিন্তু একটি পয়সা সে যুগীকে দিয়া যাইবে না। যা কিছু তাহার আছে সব সে কালই বাবুদের জিম্মা করিয়া দিবে, তার পলাতক ছেলেটা ফিরিয়া আসিলে সে পাইবে। ছেলেটা পীতমের ফিরিয়া আসিল বলিয়া।

রাসু একবার পীতমকে দেখিতে আসিয়াছিল, পীতম তাহাকে দূর দূর করিয়া খেদাইয়া দিয়াছে। রাতারাতি খুন করিয়া ময়নাদ্বীপ-ফেরত ডাকাতটা যে তার সর্বস্ব লইবে অত বোকা পীতম নয়। রাসু কাছে আসিলে সে তার ঠ্যাং খোঁড়া করিয়া দিবে। শীর্ণ হাত দুটি উঁচু করিতেও পীতমের কষ্ট হয়, রাসুর ঠ্যাং সে কেমন করিয়া খোঁড়া করিবে সে-ই জানে।

কুবেরের কাছে রাসু মনোবেদনা জানায়। একমাত্র ভাগ্নে সে পীতমের, তাকে পীতম ত্যাজ্য করিয়া দিল! কত দুঃখ-কষ্ট পাইয়া সে ফিরিয়া আসিল ময়নাদ্বীপ হইতে, দুদিন বাড়িতে ঠাঁই দিল না, অম্লান বদলে খেদাইয়া দিল রাস্তায়। মরিবার সময় এখন কাছে থাকিয়া একটু সেবা করিবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়াছে, তাহাকেও বুড়া তাহাকে সন্দেহ করিবে, বাড়িতে ঢুকিতে দিবে না? তাছাড়া নিজের ভাগ্নে সে পীতমের, বুড়ার টাকা পয়সা বাড়ি-ঘরের একটা অংশ কি তার পাওয়া উচিত নয়? কাকে ওসব দিয়া যাইবে বুড়া?

কুবের বলে, পোলার লাইগা থুইয়া যাইব কয়!

রাসু বলে, পোলা! বাঁইচা আছে নাকি স্যায়! গাঙে ডুইবা গেছে গা কবে? আলস্যে সময় কাটায় কুবের, গ্রামে জোয়ান মানুষগুলি জীবিকা অর্জনের জন্য বাহির হইয়া যায়, গ্রামে থাকে, শুধু বুড়া, শিশু ও নারীর দল, কুবের শুধু শুনিতে পায় পাকা মুখের আপসোস আর নরম গলার কলহ। দেখা হইলেই হীরু জেলে অনন্তবাবুর নাম করিয়া কুবেরকে পরিহাস করে। কোনদিন কুবের রাগে, কোনদিন তাহার মন খারাপ হইয়া যায়। আজ কতকাল অনন্তবাবু গ্রামে নাই, কলিকাতার বাবু তিনি, জেলেপাড়ায় রাত্রে স্কুল খুলিবার মতলবে কবে তিনি দু'চারবার কুবেরের বাড়ি যাতায়াত করিয়াছিলেন, এখনও তাহা মনে করিয়া রাখা কী জন্য? শুধু কুবেরের বাড়ি তো নয়। কী পাগলামি মেজবাবুর আসিয়াছিল কে জানে, জেলেপাড়ার মানুষগুলির সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়ার জন্য, সময় নাই অসময় নাই আসিয়া হাজির হইতেন, বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া দেশের নাম করিয়া কী যেন সব বলিতেন দুর্বোধ্য কথা। কতদিন নির্জন দ্বিপ্রহরে কত বাড়ির ভিতর হইতে মেজবাবুকে কুবের বাহির হইতে দেখিয়াছে। তাহার পঙ্গু অসহায় স্ত্রীর নামের সঙ্গে শুধু মেজবাবুর নামটা হীরু জড়ায় কেন?

হীরুকে একদিন কুবের মারিবে। বেদম মারিবে।

বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া সময় কাটায় কুবের, মনটা তাহার ভাল নাই। জগা মাঝির বৌ যেন কপিলার অনুকরণ করিয়া হাঁটিয়া শিখিয়াছে, ভিজা কাপড়ে পথ চলিতে চলিতে চমকাইয়া উঠিয়া পেছনে কুবেরকে দেখিয়া তাহার চোখে সন্দেহ ঘনাইয়া আসার আগে কুবেরের তো অন্যমনস্কতা ঘোচে না। অপ্রতিভ হইতে হয় কুবেরকে। নকুলের বাড়ির সামনে কুলগাছটার তলে একদিন কপিলার পায়ে কাঁটা বিঁধিয়াছিল। মিছা কথা, কাঁটা বিঁধে নাই। উঃ, বলিয়া কুবেরকে জড়াইয়া ধরিবার চল সেটা কপিলার। কেতুপুরে দুর্গা প্রতিমা দেখিয়া ফিরিবার সময় সেদিন কি ছলনাময়ীই কপিলা হইয়া উঠিয়াছিল।

গোপীকে আনিবার নাম করিয়া কুবের একদিন ভোর-ভোর গ্রাম ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল শ্যামদাসের বাড়ি আকুরটাকুর গ্রাম-হাঁটা -পথে বার-তের মাইল। ক্ষেতের আল দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিতে চলিতে কতবার যে কুবের ভাবিল ফিরিয়া আসে, আকুরটাকুরে পৌঁছাইয়া একটা পুকুরে মুখহাত ধুইতে নামিয়া কতবার সে যে পুকুরঘাট হইতে সোজা আবার আমিনবাড়ির দিকে হাঁটিতে আরম্ভ করা স্থির করিয়া ফেলিল তার হিসাব নাই।

তবু শেষ পর্যন্ত শ্যামাদাসের বাড়ির দরজাতেই পথ শেষ হইল তাহার।

শ্যামাদাস মাঠে গিয়াছিল। কিন্তু শ্যামাদাসের মা-বোন ঘড়-বাড়ি জুড়িয়া আছে, কপিরা এখানে ঘোমটা-টান-বৌ। কুটুম্বকে শ্যামাদাসের মা খাতির করিয়া বসিতে দিল, কুশল ও

এদিকে আসিবার প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিল। শ্যামাদাসের বাড়ি-ঘর দেখিয়া কুবের মনে মনে পীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল, ভালরকম জবাব দিতে পারিল না। চার ভিটার চারখানা বড় বড় ঘর শ্যামাদাসের, চারিদিকে লেপা-পোছা ঝকঝকে। ঘরের মধ্যে উঁকি দিলে কত জিনিস চোখে পড়ে. কাঠের সিন্দুক, বেতের ঝাঁপি, বাসন-কোসন—কত কিছু। উঠানের একাপাশে ধানের মরাই, অপর পাশে গোয়ালঘর। লক্ষ্মীশ্রী-মাখানো সম্পন্ন গৃহস্থের ঘর-সংসার, কুবেরের ভাঙা কুটীরের তুলনায় বৈকণ্ঠপুরী। বুকের ভিতরে টাটায় কুবেরের। এই বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী গিয়া তাহার ভাঙা ঘরে শাকান্ন খাইয়া কটা দিন কাটাইয়া আসিয়াছিল বলিয়া আজও সে আকাশকুসুম রচনা করে, ভাবে আজও লক্ষ্মীর মন পড়িয়া রহিয়াছে কেতুপুরে তাহার সেই নোংরা নীড়টিতে। কী বোকাই কুবের ছিল!

কপিলা জিজ্ঞাস' খবর কী মাঝি? কী মনে কইরা আইলা? ভালানি আছে পোলাপানরা?

ডুবে শাড়ি পরিয়াছে কপিলা, চুলের তেলে কপাল তাহার ভিজিয়া গিয়াছে। দেহ যেন উথলিয়া উঠিয়াছে কপিলার, বর্ষার পদ্মার মত। কী ভীষণ খুশী মনে হইতেছে কপিলাকে! নিজের মলিন কাপড় ও চাদরটির লজ্জায় কুবেরের ছুটিয়া পলাইতে ইচ্ছা হইতে থাকে।

কয়েক মিনিট সাধারণ কথাবার্ত বলিয়া কপিলা আবার রাঁধিতে যায়। আরও খানিকক্ষণ আলাপ করিয়া কপিলার শাশুড়ীও প্রস্থান করে। বাড়ির দু একটি ছেলেমেয়ে শুধু ঘোরাফেরা করে কুবেরের কাছে, তারপর তারাও চলিয়া যায়। কুবের বসিয়া থাকে একা। বোকা, নোংরা অপদার্থ কুবের। ময়নাদ্বীপে এনায়েত ও বসিরের কথা কুবেরের মনে পড়ে— মনে পড়ে জ্যোৎস্নালোকে হোসেনের কুটিরের দাওয়ায় বন্দী এনায়েতের ভাত খাওয়া, যার জন্য দ্বীপের অধিবাসীদের কাছে কবার সে মার খাইয়াছে, তারই আনিয়া দেওয়া ভাত। হোসেনের কল্যাণে কদিন পরে মিলনও তাদের হইবে— প্রকাশ্য, সামাজিক, আইনসঙ্গত মিলন। কী আশ্চর্য ভাগ্য লইয়া এক-একটা লোক জন্মায় জগতে! বসিয়া থাকিতে পথ চলার শ্রান্তিতা ঢুল আসে কুবেরের। আধ-জাগা আধ-ঘুমানো অবস্থায় সে স্বপ্ন দেখিতে থাকে, রচনা করিয়া চলে আকাশ-কুসুম। সর্বশক্তিমান হোসেনকে সে যেন বলিয়াছে, কপিলাকে পাইলে সপরিবারে সে ময়নাদ্বীপে গিয়া বাস করিবে— গনেশকেও বলিয়া সে রাজী করিবে যাইবে। হোসেন তাহার চিরন্তন হাসি হাসিয়া যেন বলিয়াছে, তাই করুম কুবির বাই, তাই করুম— আইনা দিমু কপিলারে। তারপর যেন একদিন—

কপিলা আসিয়া বলে, থাকবা না কি মাঝি?

কুবের বলে, না!

দুইদিন থাইকা যাও? আইছ ক্যান কও দেহি?

সুবচনীয় হাটে যামু মন কইরা বাইরইছি কপিলা। তা ভাবলাম তরে দেইখা যাই।

কপিলা মুচকি হাসিয়া বলে, সুবচনীর হাট নাকি আইজ?

কুবের বিবর্ণ হইয়া বলে, না?

হাটে গিয়া ঘুমাইয়া থাকগা মাঝি, কাইল হাট কইরা বাড়িতে যাইও, বলিয়া কপিলা রান্না ঘরে যায়। কুবের উঠিয়া নামিয়া যায় উঠানে। লাউমাচার কাছে সে দাঁড়ায়। লজ্জায় মুখখানাতে তাহার মাচার উপরকার উপুড় করা কালো হাঁড়িটার ছায়া পড়ে যেন। কপিলার সঙ্গে সে কেন পারিয়া উঠিবে? পদ্মানদীর বোকা মাঝি সে, এক হাটে কিনিয়া কপিলা তাহাকে আর এক হাটে বেচিয়া গিয়াছে—অনেকদিন আগে।

দুপুরবেলা বাড়ি ফিরিয়া কুবেরকে দেখিয়া শ্যামাদাস খুশী হইল। দুজনে পুকুরে স্নান করিয়া আসিয়া একসঙ্গে খাইতে বসিল। অতিথি আসিয়াছে বলিয়া আজ অনেক রান্না করিয়াছে। কিন্তু খাদ্যে কুবেরের রুচি ছিল না। কুবেরের হঠাৎ আসিবার কারণটা শ্যামাদাসও জানিতে চাহিল। কুবের এবার এক আশ্চর্য মিথ্যা রচনা করিয়া বসিল: হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপে গিয়া বাস করিতে চাহিবে এমন যদি কেহ জানা থাকে শ্যামাদাসের। অনেক সুবিধা

সেখানে বাস করার। বাড়ি-ঘর অন্ন-বস্ত্র জমি-জমা সব এখন বিনা মূল্যে পাওয়া যাইবে, দশ-বিশ বছর পরে দ্বীপে বসতির বিস্তার হইলে নামমাত্র খাজনা ধার্য হইবে জমির, পুরুষানুক্রমে স্বত্ব জন্মিবে জমিতে। শ্যামাদাস যদি দশজনকে এই সুবর্ণ সুযোগের সংবাদ জানায় আর কেহ ময়নাদ্বীপে যাইতে রাজী হইলে কুবেরকে যদি খবর দেয়, বড় ভাল হয় তবে।

শ্যামাদাস অবাক হইয়া বলিল, চা-বাগানের ঠিকাদারি নিছ নাকি মাঝি, আঁই?

চা-বাগান? কিসের চা-বাগান? শ্যামাদাস চলুক না ময়নাদ্বীপ দেখিয়া আসিবে। আইজ্ঞ চলুক।

তুমি যাও না ক্যান ময়নাদ্বীপি? শ্যামাদাস জিজ্ঞাসা করিল। কুবের থতমত খাইয়া বলিল, আমিও যামু।

আজ এখানে থাকিয়া যাওয়ার জন্য কুবেরকে অনেক অনুরোধ করিল শ্যামাদাস। কিন্তু থাকিবার উপায় কি আছে কুবেরের! গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া তাহাকে ময়নাদ্বীপের বারতা প্রচার করিতে হইবে।

সুবচনীর হাটের ভিতর দিয়া আমিনবাড়ির পথ। হাটের শূন্য চালাগুলি খাঁ খাঁ করিতেছিল, পথের ধারে স্থায়ী দোকান ও আড়তগুলি শুধু খোলা আছে। একটা খাবারের দোকানের সামনে নড়বড়ে বেঞ্চিটাতে কুবের বসিয়া পড়িল। ভয়ানক শীত করিতেছিল কুবেরের, শরীরটা ছমছম করিতেছিল আর চোখ দুটো করিতেছিল জ্বালা। হুড়মুড় করিয়া জ্বর যে আসিতেছে অনেকক্ষণ আগেই সে তাহা টের পাইয়াছিল। বেঞ্চিটা রোদে সরাইয়া চাদর মুড়ি দিয়া সে শুইয়া পড়িল। ক্রমে অপরাহ্ণ হইয়া আসিল, দোকানের ছায়া কুবেরকে অতিক্রম করিয়া হাটের চালাগুলির মাথায় উঠিয়া গেল, কুবের তেমনিভাবে পড়িয়া রহিল বেঞ্চিটাতে। শেষে ময়রা তাহাকে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল।

জ্বর আসিবার মুখে ভোজ খাইয়াছিল, অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে কুবেরের। কপিলার স্বামী শ্যামাদাসের অবস্থা ভাল বলিয়া, সে জ্ব-গায়ে পথে নামিয়া আসিয়াছে, এত জ্বর যে আসিবে কুবের তা ভাবিতে পারে নাই। মাথার মধ্যে যেন কুয়াশা নামিয়াছে আর শব্দ হইতেছে গমগম। কোথায় কী অবস্থায় সে পড়িয়া আছে তাও মাঝে মাঝে গোলমাল হইয়া যাইতেছে সব,— সমুদ্র তরঙ্গ, দুর্গাপূজার আলো, অন্ধকার একটা চাঁচের বেড়ার বাহিরে সারিসারি ঘুমন্ত মানুষ, বার বার জালা নামানো উঠানো, ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা মাছের লাফালাফি সব একাকার হইয়া যাইতেছে। ময়রা মুখের চাদর সরাইয়া দিলে কুবের আরক্ত-চোখে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে, বিড়বিড় করিয়া বলে, শ্যামাদাসের খবর দিবা, আকুরটাকুরের শ্যামাদাস?

সন্ধ্যার পর কুবের আবার ফিরিয়া গেল কপিলার কাছে, তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া একটা মোটা কাঁথা তাহার গায়ে চাপাইয়া দিয়া কপিলা রাঁধিতে গেল। অন্ধকার ঘরে কুবের শুইয়া রহিল একা।

শেষরাত্রে ঘাম দিয়া কুবেরের জ্বর ছাড়িয়া গেল। সেইসঙ্গে ঘুমও ভাঙিয়া গেল তাহার, আর ঘুম আসিল না। একটা বিশ্রী বোঁটকা গন্ধে সে বড় অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। অল্প অল্প আলো হইলে উঠিয়া আসি। ঘরখানা খুবই ছোট, ঘরের অর্ধেক জুড়িয়া পাটের স্তূপ আর দরজার কাছে প্রকাণ্ড একটা পাঠা বাঁধা শুইয়া শুইয়া দাড়ি নাড়িয়া জাবর কাটিতেছে।

শরীরটা বড় দুর্বল বোধ হইতেছিল কুবেরের। ধীরে ধীরে উঠিয়া সে বাহিরে গেল। কপিলা উঠানে গোবর লেপিতেছিল, বলিল, কিবা আছ মাঝি?

কুবের ক্ষীণস্বরে বলিল, জ্বর নাই। আমি অখন যামু কপিলা৷খেনি যাইবে কুবের, এই ভোরে? নাইবা গেল সে আজ দুর্বল শরীর লইয়া? একটু সুস্থ হইয়া কাল গেলে হয় না? অন্তত কিছু খাইয়া যাক সে। এখনি দুধ দুহিয়া কপিলা জ্বাল দিবে, একটু দুধ খাইয়া যাক।

না, কুবের কিছু খাইবে না। প্রয়োজন নাই। পাঠা ও পাটের সৌরভে তার পেট ভরিয়া গিয়াছে। বিষণ্ণ বদনে কুবের মাথা নাড়ে। পদ্মানদীর কূল ছাড়িয়া দশ মাইল তফাতে চলিয়া

আসিয়াছে সে, মন কেমন করিতেছে তার। গঙ্গার বাতাস গায়ে না লাগিলে, কেতুপুরের মেছো গন্ধ না শুঁকিলে, সে সুস্থ হইবে না।

কপিলা গোবর লেপা স্থগিত করিয়া বলে, গোসা করছ মাঝি? গোসা কইরো না। ঘরভরা মাইনষের পাল, ঘর নি আছে আর তোমারে দিমু শোওনের লাইগা?

কুবের বলিল, হ রে কপিলা হ। ব্যাজাল পারিস না, তর ব্যাজালে গাও জ্বলে।

গাও জ্বলে মাঝি? গাও জ্বলে?

হ, জ্বলে! গরু-ছাগল ভাবস আমারে তুই, খেলা করস আমার লগে। তরে চিনা গেলাম কপিলা, পরনাম কইয়রা গেলাম তরে।

কপিলা ফিসফিস করিয়া বলে চুপ কর মাঝি, বেবাকে শুনব। যাইবা যাও, কী আর কমু তোমারে? এউককা কথা কহিয়া দিই মাঝি, মাথা খাও দিদিরে কথাটা কইও! কইও, কপিলা পরের ঘরের বৌ, পরের মাসনে কপিলার মুখে রাও নাই। অতিথ কই থাকব, অতিথ কী খাইব, কপিলারে কেডা জিগায়? দুষী কইরো মাঝি, শাইপো— কিন্তু এই কথাডা কইও দিদিরে, মাথা খাও মাঝি, কইও।

কার লগে কথা কস বৌ?— ঘরের ভিতর হইতে শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করে।

কপিলা চাপা সুরে বলে, যাও গা মাঝি। ক্যান আইছিলা তুমি!

আমিনবাড়ির হাসপাতাল হইতে গোপীকে সঙ্গে করিয়া জলপথের কুবের গ্রামে ফিরিল। তাহার শীর্ণ চেহারা দেখিয়া মালা বারবার জিজ্ঞাসা করিল কী হইয়াছিল তাহার, ফিরিতে এত দেরী হইল কেন? প্রশ্নগুলিকে এড়াইয়া গেল কুবের। অল্প সময়ের মধ্যে অকস্মাৎ অনেকগুলি বিচিত্র অভিজ্ঞতা কুবেরকে যেন নতুন মানুষ করিয়া দিয়াছে, নদীতীরের একটানা জীবনে তাহার গত কয়েকটি মাস চিরস্মরণীয়। কোথায় ছিল কপিলা, কোথায় ছিল আশ্বিনের ঝড়, কোথায় ছিল ময়নাদ্বীপ! সব একসঙ্গে ভিড় করিয়া আসিয়াছে তাহার জীবনে।

গ্রামে ফিরিয়া কুবের দেখিল, রাসু ইতিমধ্যে পীতমের সঙ্গে ভাব করিয়া ফেলিয়াছে। যুগীর ছেলে হইয়াছে, পীতমকে কে আর দেখিবে, কাজটা তাই পাইয়াছে রাসু। যুগীর মত রাসুকেও সে সর্বদা শাপান্ত করে, রাসু নীরবে সেবা করে বুড়ার, রাগও করে না দুঃখিত ও হয় না। রাসুর ধৈর্য দেখিয়া কুবের খুশী হয়, পীতম খুশী থাকিলে রাসু হয়তো কিছু পাইবে টাকা-কড়ি, গোপীরই ভাল হইবে তাহাতে। এমন কি, পীতমকে দেখিতে গিয়া তার কাছে রাসুর কিছু প্রশংসাও করিয়া আসে কুবের। বলে, মনটা ভাল রাসুর, দয়া-মায়া আছে রাসুর কিছু প্রশংসাও করিয়া আসে কুবের। বলে, মনটা ভাল রাসুর, দয়া-মায়া আছে রাসুর বুকে, নকুল-টকুলের মত পাজী সে নয়। পীতম শোনে কিন্তু বিশ্বাস করে না। বলে, অরে তুই চিনিস না কুবির, অ ডাকাইত। একদিন আমার বুকে চাকু মাইরা সর্বস্ব নিয় পলাইব হারামজাদা, তুই আছস কোন তালে?

কুবের প্রতিবাদ করে। না রাসু সেরকম নয়। বড় ভাল রাসু।

কয়েকদিন পরে হোসেন মিয়া ফিরিয়া আসিয়া কুবেরের অলস দিনগুলি শেষ হয়। রকমারী ব্যবসা হোসেন, ধান, পাট, বিড়ির পাতা, তামাক, গুড়, চিনি, মসলা-পাতি এক-একবার এক-এক রকম বোঝাই নিয়া কুবের বন্দর হইতে বন্দরে যাতায়াত করে। গোয়ালন্দের অপর তীরে একবার সাত-শ চাগল আসিয়া হাজির। সারাদিন ধরিয়া কুবের তাহাদের নদী পার করিল। ছাগলের গন্ধে বার বার তাহার মনে পড়িতে লাগিল কপিলার বাড়িতে এক কষ্টকর রাত্রি যাপনের কথা। বাড়িতে পরের শাসনে নিরুপায় নির্বাক বৌ কপিলা যেখানে তাকে পাট-জমানো পাঁঠা-বাঁধা ভাঙা ঘরখানায় শুইতে দিয়াছিল।

তারপর একদিন চাঁদপুর যাওয়া হুকুম পাওয়া গেল। তাড়াতাড়ি যাইতে হইবে, দিবামাত্র নৌকা বাহিয়া যাওয়া চাই। গণেশ বিরক্ত হইয়া গজগজ করিতে লাগিল। শম্ভু ও বগা বহুদিন হোসেনের অধীনে কাজ করিয়াছে, তাহারা কিছুই বলিল না, প্রাণপণে বৈঠা বাহিয়া কুবেরকে

অবাক করিয়া দিল। হোসেনকে কুবের এখন কিছু কিছু চিনিতে পারিয়াছে। সাধারণত সময়ে হিসাব হোসেনের একটু শিথিল, নৌকার ক্ষেপ দিতে মাঝিরা দেরি করিলে কিছু বলে না, সে, শম্ভু ও বগা তাই গা ছাড়িয়া দিয়া বৈঠা ধরে, কুবেরকে তারা গ্রাহ্য করে না। কিন্তু হোসেন যখন মুখ ফুটিয়া বলে যে দ্রুতগতি প্রয়োজন, শম্ভু ও বগার শৈথিল্য অন্তর্হিত হয়। এমনভাবে বৈঠা বাহিতে থাকে তাহারা যেন ভূতে পাইয়াছে তাহাদের। মনে মনে সায় দেয় কুবের। এমনিভাবেই কাজ নিতে হয় বটে মানুষের কাছে, এমনি কৌশল! একটু সময় দুবার বলিতে হয় না, এতটুকু ইঙ্গিত পাইলে আলস্য পরিতৃপ্ত মাঝিরা সহসা অতিমাত্রায় কর্মঠ হইয়া ওঠে।

হোসেনের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় কুবের প্রতিনিয়তই পায়। বিস্তৃত তাহার কর্মক্ষেত্র, এখানে ওখানে ছড়ানো তাহার জীবন, এলোমেলো তাহার চলা-ফেরা, তবু চারিদিকে সামঞ্জস্য, সব নিয়মে বাঁধা। একটা জটিল বিশৃঙ্খলায় সে সব শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দিয়াছে।

চাঁদপুরে হোসেন মিয়া নৌকায় যোগ দিল। ময়নাদ্বীপের পথেই এবারও নৌকা চলিল, নোয়াখালির উপকূলে ক্ষুদ্র একটি গ্রামের কাছে নৌকা বাঁধা হইল। নৌকায় বোঝাই দেওয়া হইল নারিকেল। বোঝাই শেষ হইল কিন্তু নৌকা খুলিবার হুকুম হোসেন দিল না। দুইদিন সেখানে নিষ্কর্মা হইয়া তাহারা বসিয়া রহিল।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যার সময় নদীর মোহনার দিক হইতে মুসুরি-বোঝাই প্রকাণ্ড একটা সমুদ্রগামী বোট আসিয়া ভিড়িল, পাশে, চট্টগ্রামবাসী এক বৃদ্ধ মুসলমান আসিয়া অনেকক্ষণ হোসেনের সঙ্গে করিল পরামর্শ। বোট হইতে তারপর ত্রিপল-মোড়া কী যেন আসিল এই নৌকায়, ছই-এর মধ্যে পাটাতনের তলে হোসেন তাহা লুকাইয়া ফেলিল। তারপর হোসেন ও বৃদ্ধ মুসলমান নামিয়া গেল তীরে, গুণিয়া গুণিয়া হোসেন কতগুলি নোট তাহার হাতে দিল, নৌকায় ফিরিয়া আসিয়া বলিল, নাও খোলো কুবির বাই।

বড় কৌতূহল হইতেছিল কুবেরের। পাটাতনের নীচে কী লুকাইয়া রাখিয়াছে হোসেন? হোসেনকে প্রশ্ন করিবার সাহস কুবেরের হইল না। অনেক রাত্রে নৌকা বাঁধিয়া রাঁধিবার আয়োজন করিবার সময় শম্ভুকে সে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল।

শম্ভু বলিল, আপিম মিয়া, আপিম। চুপ যাও।

আপিম? চুপি চুপি আপিমের ব্যবসা করে হোসেন? এ তো ভাল কথা নয়! নানা দিকে কত উপার্জন হোসেনের, এইসব অসদুপায়ে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা কেন তার? তা ছাড়া চোরাই আফিমের ব্যবসা তো সহজ বিপদের কথা নয়। ধরা পড়িলে কী উপায় হইবে তখন? কুবেরের ভয় করিতে লাগিল। হোসেন মিয়ার সঙ্গে যেদিন সে ভিড়িয়াছে সেইদিন হইতেই সে জানে একদিন অনিবার্য বিপদ আসিবে একেবারে সর্বনাশ হইয়া যাইবে। আজ কুবের বিপদের স্বরূপটা বুঝিতে পারিল। আজ হোক, কাল হোক, হাতে পড়িবে হাতকড়া, তারপর দু-দশ বছর জেলের বাহিরে কুবেরকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

ছই-এর ভিতরটা হোসেন মিয়া দখল করিয়াছে, নৌকার উন্মুক্ত অংশে হোগলার ঢাকনি চাপাইয়া মাঝিরা শয়ন করে। শুইয়া শুইয়া কুবের অনেক আবোল-তাবোল চিন্তা করিল। একবার ভাবিল, এবার গাঁয়ে ফিরিয়া হোসেন মিয়ার নৌকায় আর সে কাজ করিবে না। জেলে যাওয়ার চেয়ে না খাইয়া মরাও ভাল। কিন্তু না খাইয়া মরার সঙ্গে কুবেরের পরিচয় আছে। হোসেন মিয়ার সঙ্গে ভিড়িয়া জীবনে সে সচ্ছলতার সুখ জানিয়াছে। এই কাজ ছাড়িয়া দিলে যে অবস্থা তাহার হইবে খানিকক্ষণ সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া কুবের বুঝিতে পারে জানিয়া-শুনিয়া ইচ্ছা করিযা দারিদ্র্যকে বরণ করিবার ক্ষমতা আর তাহার নাই। ক্ষোভে কুবেরের চোখে জল আসে। এ কী অন্যায় হোসেন মিয়ার! এইসব বিপজ্জনক কাজগুলি বাদ দিলে তাহার তো কাজের অভাব নাই, সেসব কাজে ব্যাপৃত বাহিবার মজুরিই পাইবে?

মনে মনে কুবের কলহ করে হোসেনের সঙ্গে। কল্পনায় সে বার বার এই ঘটনাগুলি ঘটাইয়া যায়। হোসেনের অন্যায়টা বুঝাইয়া দিতে সে ভারি অনুতপ্ত হয়, তাড়াতাড়ি কোমরের

কালো বেল্ট হইতে একতাড়া নোট নিয়া সে কুবেরকে দেয়! চার ভিটায় চারখানি বড় বড় ঘর তোলে কুবের, গোয়াল করে ধানের মরাই করে, ঝাঁকার উপর লাউলতা তুলিয়া দেয়। তারপর একদিন কপিলাকে নিমন্ত্রন করে। কপিলার পা দুই জড়াইয়া ধরিয়া বলে যে তাকে ছাড়িয়া থাকিতে বুক ফাটিয়া গিয়াছে কুবেরের—ও কপিলা, আমারে ফেইলা যাইস না, যাইস না—আমি নি মইরা গেলাম কপিলা তোরে না দেইখা!

কেতুপুরে ফিরিয়া কুবের এক আশ্চর্য সংবাদ শুনিল!

পীতমের বাড়িতে চুরি হইয়া গিয়াছে।

গভীর রাত্রে ঘরে সিঁদ কাটিয়াছে চোর। ঘরের কোণের কোথায় পীতম মস্ত একটি ঘটি ভরিয়া টাকা পুঁতিয়া রাখিয়াছিল, চোরের তহা জানিবার কথা নয়। তবু সেখানটা খুঁড়িয়াই ঘটিটা চোর নিয়া গিয়াছে।

টাকার শোকে বড় কাতর হইয়া পড়িয়াছে পীতম। চুরির ব্যাপারে রাসুকেই সে সন্দেহ করে। রাসু নিজে সিঁদ দিয়াছে এ কথা সে স্পষ্ট বলে না, তবে চোরের সঙ্গে রাসুর যে যোগ আছে তাতে পীতমের সন্দেহ নাই। ঘরের লোক বলিয়া না দিলে সন্ধান চোর পাইত কোথায়?

পীতমের গালাগালিতে রাসু কখনো রাগ করে নাই। কিন্তু এবার চুরির অপবাদ দেওয়ামাত্র পীতমকে আচ্ছা করিয়া কড়া কড়া কথা বলিয়া সে চলিয়া গিয়াছে। এটাও বড় সন্দেহজনক।

চুরির অপবাদের জন্য যেন নয়! টাকার সঙ্গেই যেন সে গিয়াছে? এতদিন গেল না কেন তবে, পীতমের যতদিন টাকা ছিল?

কুবের খবর নিতে গেলে পীতম কাঁদিয়া চোর, রাসু ও বিশ্বসংসারের বিরুদ্ধে তার নালিশ জানাইতে লাগিল। হায়, তার সারা জীবনের সঞ্চয়, সাত-কুড়ি তের টাকা! কোথায় আছে তার সেই পলাতক পুত্র, বুড়ো বাবাকে মনে করিয়া কবে ফিরিয়া আসিবে সেই আশায় শীতল যে টাকাগুলি জমাইয়া রাখিয়াছিল। সে কি চোরকে দিবার জন্য? লক্ষীছাড়া রাসুর পেটে যাওয়ার জন্য?

কুবের বলে, রাসু জানল কিবা কই থুইছিলা ঘটি?

তা কি পীতম জানে? যে শয়তান রাসু কেমন করিয়া যেন টের পাইয়া গিয়াছে ঘটিটা কোথায় পোঁতা ছিল, রাসুর অসম্ভব কাজ নাই। ঘটির সন্ধান করিতেই হয়তো সে আসিয়াছিল পীতমকে সেবা করিবার ছলে! সারাদিন ঘরের মধ্যে ঘুরিত রাসু—একোণ ওকোণ করিয়া বেড়াইত, আর তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে মেঝের দিকে চাহিয়া কী যেন খুঁজিত! তখনি সন্দেহ হইয়াছিল পীতমের। হায়, তখন যদি সে সাবধান হইত।

কুবের বিশ্বাস করিল না রাসুর অপরাধ। ঘটি কোথায় পোঁতা তাই যদি রাসু জানিবে, চোরের সঙ্গে যোগ দিয়া টাকার সে ভাগিদার জুটাইবে কেন? নিজেই তো অনায়াসে চুপিচুপি ঘটিটা সরাইয়া ফেলিতে পারিত, তারপর গর্ত বুজাইয়া লেপিয়া মুছিয়া ঠিক করিয়া রাখিলে কত কাল পরে পীতম টাকা চুরির কথা টের পাইত ঠিক ছিল না। সিঁদ কাটিবার হাঙ্গামা রাসু করিতে যাইবে কেন?

চৌকিদার থানায় খবর দিয়াছিল। পুলিস আসিয়া চুরির তদন্ত করিল। পুলিশ দেখিয়া কুবেরের বুকের মধ্যে কাঁপিতে আরম্ভ করিয়া দেয়, হোসেন মিয়ার সঙ্গে এবার নৌকাযাত্রা করিয়া আসিয়া পুলিসের জন্য চিরন্তন স্বাভাবিক ভীতিটা কুবেরের অস্বাভাবিক রকম প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। পুলিসের কাছে পীতম অম্লান বদনে বলিয়া দিল রাসুকে সে সন্দেহ করে।

রাসুকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করা হইল, তার ঘরখানা খুঁজিয়া দেখা হইল, তারপর রাসুর হাতে হাতকড়া না দিয়াই পুলিস চলিয়া গেল। না, রাসুর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নাই।

পুলিস চলিয়া গেলে পীতমের বাড়ির সামনে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ রাসু যা মুখে আসিল তাই বলিয়া পীতমকে অভিসম্পাত করিল। শুনিয়া কে বলিবে পীতম তার মামা।

তারপর একদিন সকালে কুবেরের কাছে আসিয়া রাসু জিজ্ঞাসা করিল, কবে বিয়া দিবা?

কুবের তৎক্ষণাৎ সন্দিগ্ধ হইয়া বলিল, গতিক কিরে রাসু? পীতম খুড়ার টাকা তুই নিছস?

রাসুর মুখখানা একটু বিবর্ণ হইয়া গেল বৈকি?

যে বলিল, কী কও লখার বাপ, আঁই? টাকা নাই আমার? কাম করি না আমি?

কী কাম করস?

শেতলবাবু কাম দিছেন বাবুগো নায়। মামার ঘরে চুরি করুম? অমন কথা কইও না লখার বাপ?

তখন কুবের বলিল, পণের টাকা দিয়া থো না ক্যান তবে?

রাসু বলিল, দিমু। কবে বিয়া দিবা কও।

গোপী সারিয়া উঠিতেছিল। এখনো যে ভাল করিয়া হাঁটিতে পারে না বটে, তবে ক্রমেই পায়ে জোর পাইতেছে। মাসখানেস পরে বিবাহ তাহার দেওয়া যায়। কিন্তু বিবাহের আগে টাকাটা কুবেরের পাওয়া চাই, মেয়ের গায়ে ওঠা চাই গহনা। রাসুর মুখের কথার নির্ভর করিয়া থাকিবার পাত্র সে নয়।

যথাসময়ে টাকা ও গহনা দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া রাসু বিদায় হইল। প্রতিজ্ঞ করিল সে অবলীলাক্রমে, রাসুর যেন টাকার ভাবনা শেষ হইয়াছে বাবুদের নৌকায় কাজ পাইয়া, সে যেন বড়লোকই হইয়া গিয়াছে। টাকা ও গহনর কথা শুনিয়া একদিন মুখে তাহার কালিমা ঘনাইয়া আসিয়াছিল, আজ সে নির্ভর নিশ্চিন্ত!

মালা বলে, রাসুরে য্যান কেমন কেমন দেহি, আমি ডরাই মাঝি।

কুবের বলে, ডরাইয়া কাম নাই তর।

আঁই? বলিয়া মালা অবাক হইয়া থাকে।

কুবের গোপীকে ডাকে। লাঠি ধরিয়া হাঁটিতে বলে গোপীকে। গোপী কষ্টে উঠিয়া দাঁড়ায়, কষ্ঠে দু-এক পা হাঁটে। কুবের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়া বলে, সারব গোপীর মা, খাসা সারব পাওখান গোপীর। রাসুর লগে ক্যান দিমু বিয়া?

কইলা যে রাসুরে?

কুবের একগাল হাসে। বলে, তুই নি মাইয়ালোক গোপীর মা, বোঝস না। রাসুরে হাতে থুইছি, পাও যদি না স্যারে মাইয়ার, রাসুর লগেই দিমু। আর সাইরা যদি যায় গোপীর মা, পাওখান যদি সাইরা যায় গোপীর—

মহোৎসাহে কুবের গোপীর হাঁটুতে হাসপাতালের দেওয়া ওষুধ মালিশ করিতে থাকে। জোরে জোরে ঘষে কুবের, ব্যথায় গোপী কাতরায়। কুবের ধমক দিয়া বলে, চুপ থাক চুপ থাক। জোর জোর না দিমু ত সারব ক্যান? মালিশ করিতে করিতে থামিয়া গিয়া হাঁটুটা সে টিপিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে। বলে, ফুলা কমে নাই গোপীর মা?

হ। কম যেন লাগে।

বলিয়া মলা উৎসুক চোখে গোপীর পায়ের দিকে চাহিয়া থাকে। অনেকক্ষণ পরে সলজ্জভাবে বলে, মনে এউক্কা সাধ ছিল মাঝি। কমু?

হ, এমনিভাবে ভণিতা করে মালা। মালার তামাটে মুখখানা একটু রাঙা দেখায়। আস্তে আস্তে সে জিজ্ঞাসা করে কুবেরকে হাসপাতালের যে ডাক্তার গোপীর পা ভাল করিয়া দিয়াছে সে কি মালার পা খানার কিছু করিতে পারে না? একবার গিয়া দেখাইয়া আসিলে হয় কিন্তু। কিছু যদি ডাক্তার না করিতে পারে নাই করিবে, মালার সাধ একবার গিয়া দেখাইয়া আসে। কুবের কী বলে?

কুবের গম্ভীর হইয়া বলে, তর পায়ের কিছু হইব না গোপীর মা।

কেন? হইব না কেন? মালা জিজ্ঞাসা রে। আহা, একবার দেখাইয়া আসিতে দোষ কি? ডাক্তার যদি বলে কিছুই হইবে না, নিজের কানে শুনিয়া আসিয়া মালা নিশ্চিত হইয়া থাকিবে

একবার লইয়া চলুক কুবের তাহাকে। একফোঁটা যদি মায়া থাকে তার জন্য কুবেরের বুকে, একবার সে তাকে লইয়া চলুক সদরের হাসপাতালে। কুবের কি বুঝিবে খোঁড়া পায়ের জন্য সারাজীবন কী দুঃখ মালা পুষিয়া রাখিয়াছে মনে।

না? লইয়া যাইবে না কুবের? আই গো কুবেরের পাষাণ প্রাণ! মালার চোখে জল আসে। বিনাইয়া সে বলিতে থাকে, যে মেয়ের জন্য কুবের দশবার হাসপাতাল যাইতে আসিতে পারে, মালাকে একবার শুধু একটিবার লইতে তাহার আপত্তি! হ'অনেক পাপ করিয়াছিল আর জন্মে মালা, এবার তাই এমন কপাল লইয়া জন্মিয়াছে। কোলের ছেলেটাকে মালা মাই ছাড়াইয়া নীচে ফেলিয়া দেয়, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বসিয়া দরজার খুঁটিতে ঠকঠক করিয়া মাথা ঠোকে আর কাঁদিতে কাঁদিতে আহ্বান করে মরণকে— যে মরণ এমন নির্দয় যে মালার মত পোড়া-কপালীর দিকে ফিরিয়াও তাকায় না।

চুপ যা গোপীর মা, চুপ যা!

কেন চুপ যাইবে? কুবেরের দরদ আছে নাকি মালার জন্য? সে তো কপিলার মত ভঙ্গি করিয়া হাঁটিতে পারে না যে তাকে লইয়া কুবিরে আমিনবাড়ির হাসপাতালে যাইবে, হোটেলে রাত কাটাইয়া আসিবে পরমানন্দে!

কুবের বিবর্ণ হইয়া বলে, কিবা কথা কস্ গোপীর মা? মাইরা ফেলুম কইলাম। তারপর সে সুর বদলাইয়া বলে, হাসপাতালে যাওনের লাইগা কাঁদনের কমা কী, আই? যাইবার চাস নিয়া যামুনে! যা মুখে লয় কইয়া রাগাইস না গোপীর মা!

মালা ফোঁস ফোঁস করিতে বলে, নিবা, নিয্যাস? নিবা?

নিমু।

কিন্তু মালাকে আমিনবাড়ি নিয়া যাওয়ার সময় কুবেরের হয় না। হোসেন মিয়ার কাজের এখন অন্ত নাই, অবিরত চালান আসিতেছে, চালান যাইতেছে, এ বছর সতেজে ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে হোসেন, মাঝখানে আবার একবার নৌকা লইয়া নারিকেলের ও চোরাই আপিমের চালান আনিতে কুবেরকে সেই নোয়াখালির উপকূলে যাইতে হইল। এবার আপিম পৌঁছাইয়া দিল একটি স্টীমলঞ্চে, লঞ্চে এক সাহেব আসিয়াছিল, হোসেন মিয়াকে কী তার খাতির! আপিমের পুঁটুলি নিয়া নৌকা চালাইতে এবারও কুবেরের বুকের মধ্যে সমস্ত পথ একটা আতঙ্ক জাগিয়া রহিল। গতবার ফিরিয়া গিয়া হোসেন প্রত্যেক মাঝিকে দশটা করিয়া টাকা বখশিশ দিয়াছিল— এবারও দিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু টাকার কথা ভাবিয়া কুবেরের একবিন্দু আনন্দ হইল না।

গণেশ জিজ্ঞাসা করে, কী ভাব কুবিরদা? ঝিমাও ক্যান? মিয়া বাই আপিম দিছে নাকি?

কুবের বলে চুপ যা বলদ!

গণেশ বলে, কুকীর মা রূপার পৈছা চায় কুবিরদা। ভাবি কি, ইবার মিয়াবাই টাহা দিলি দিমু পৈছা গড়াইয়া কুকীর মারে!—গণেশের খুশি ধরে না, কুবেরের গায়ে ঠেলা দিয়া বলে, হোসেন মিয়ার নায় কাম নিয়া বড় কাম করছ কুবিরদা! টাহার মুখ দেখলাম।

কুবের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুদূর নদীবক্ষে চাহিয়া বলে, উটা কিরে গণশা? পুলিশের লন্‌চো নাকি?

হ!

কুবের শিহরিয়া বলে, কোনদিকে যায়?

আমাগো দিকে আহে দেহি কুবিরদা!

কুবের বিবর্ণ মুখের হোসেন মিয়ার কাছে যায়। ফিসফিস করিয়া বলে, পুলিশ লন্‌চো আহে মিয়া ছাব।

হোসেন মৃদু মৃদু হাসে, বলে বৈঠা ধর দিয়া কুবির বাই। হোসেন মিয়া থাকতি কারে ডরাও? নদীর মধ্যে জাল ফেলাইয়া মাল উঠাইব কোন হালার পুত?

হ'? বিপদ ঘনাইয়া আসিলে আপিমের বাণ্ডিল নদীর জলে ফেলিয়া দিলেই চুকিয়া গেল? তাই হইবে বোধহয়! সেই জন্যই হয়তো হোসেন সর্বদা জলপথে আপিমের চালান নিয়া আসে, নতুবা নোয়াখালি হোক চট্টগ্রাম হোক রেলে স্টীমারে চাঁদপুর আসা ঢের সুবিধা। কুবেরের ভয় কিছু কমে। তবু সুদূর পুলিশ-লঞ্চের দিক হইতে দৃষ্টি সে ফিরাইতে পারে না। লঞ্চটি যখন ক্রমে ক্রমে আসিয়া পাশ দিয়ত্ম চলিয়া যায় কুবের শ্বাসরোধ করিয়া থাকে।

একদিন ভোরবেলা বাড়ি ফিরিয়া কুবের মালাকে দেখিতে পাইল না। গোপী বলিল, রাসুর সঙ্গে মালা আমিনবাড়ি হাসপাতালে গিয়োছে।

কুবের রাগিয়া বলিল, কার নায়?

বাবুগো নায়।

তিনদিন নদীর বুকে কাটাইয়া আসিয়াছে, মেজাজ গরম হইয়া ছিল কুবেরের। রাগে সে গুম খাইয়া রহিল। গোপী গড়গড় করিয়া ব্যাপারটা বিস্তরিত বলিয়া গেল। মালা ক দিন হইতে রাসুকে তোষামোদ করিতেছিল, কাল মেজবাবু মোকদ্দমার জন্য আমিনবাড়ি গিয়াছেন, সেই সুযোগে বাবুকে বলিয়া-কহিয়া মালা ও রাসু সঙ্গে গিয়াছে।

মেজবাবু? মেজবাবুর নৌকায় মালা আমিনবাড়ি গিয়াছে! তার দিকে কুবের কটমট করিয়া তাকায়। গোপীই যেন অপরাধিনী।

গোপী ভয়ে ভয়ে বলে, লখা লগে গেছে বাবা।

সারাদিন কুবের বাড়ি ছাড়িয়া নড়িল না। জীবনটা হঠাৎ তিতো হইয়া গিয়েছে কুবেরের কাছে। সমস্ত সকাল বেলাটা সে রাগে আগুন হইয়া রহিল, নিধু মাঝি আলাপ করিতে আসিলে তাহাকে অকথ্য গালাগালি করিয়া ভাগাইয়া দিল, বিনা দোষে মারিয়া চণ্ডীকে করিয়া দিল আধমরা। তারপর রাগ কমিয়া অপরাহ্ণে আসিল বিষাদ। কেবলি মনে হইতে লাগিল কুবেরের, মালা প্রতিশোধ লইয়াছে। কপিলার সঙ্গে সে কিনা একদিন আমিনবাড়িতেই রাত কাটাইয়া আসিয়াছিল, মালা তাই মেজবাবুর সঙ্গে সেই আমিনবাড়িতেই গিয়াছে, হাসপাতালে যাওয়ার সেই একই উপলক্ষের ছল করিয়া।

সন্ধ্যা হইল মালা ফিরিল না। অন্ধকার গা ঢাকা গিয়া আসিল হোসেন। কুবের ছাড়া বড় ঘরখানা হইতে সকলকে সরাইয়া দিয়া ঘরের মাঝখানের খুঁটি বাহিয়া উঠিয়া নিজে সে চালের খড় ফাঁক করিয়া ছোট ছোট দুটি বাণ্ডিল লুকাইয়া ফেলিল। খুঁটি বাহিতেও জানে হোসেন, গুণের লোকটার অন্ত নাই!

কুবের নীরবে এই অদ্ভুত কাণ্ড চাহিয়া দেখিল, কিছু বলিল না। নামিয়া আসিয়া হোসেন বলিল, ডরাইয়া না কুবির বাই, ডর নাই।

কুবের মুহ্যমানের মত মাথা নাড়িল।

হোসেন বসিল। বলিল যে পুঁটুলি দুটি যতদিন সে না লইয়া যায়, কুবেরের ছুটি! সারাদিন বাড়ি আসিয়া আরাম করিবে কুবের, কেমন?

চালে গোঁজা জিনিস দুটিকে সে পাহারা দিবে বটে, কিন্তু বার বার ওদিকে চাহিবার প্রয়োজন নাই কুবেরের। একেবারেই না তাকানোই ভালো। না, ঘরের চালায় কিছুই গোঁজা নাই কুবেরের। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া আজ হোসেন তাহার বাড়ি আসে নাই, খুঁটি বাহিয়া উঠিয়া ঘরের চালে কিছুই গুঁজিয়া রাখে নাই।

কী কও কুবির বাই, তাই না? হোসেন মৃদু মৃদু হাসে।

হ, বলিয়া কুবের সায় দেয়।

সকলের চেয়ে বিশ্বাস, সকলের চেয়ে নিরাপদ এই সরল পদ্মানদীর মাঝিটাকে হোসেন মিয়া যেন ভালবাসে। কত টাকা হোসেন মিয়ার দূরে দূরে ছড়ানো, কত বড় তাহার ব্যবসা, এগার মাইল লম্বা একটা দ্বীপের সে মালিক, কুবের তো তাহার চাকর, তবু কুবেরের ঘরে ছেঁড়া চাটাইয়ে হোসেন আরাম করিয়া বসে, বন্ধুর মত গল্প করে কুবেরের সঙ্গে। চেনাই যেন যায় না

এখন হোসেনকে! হোসেনের নৌকায় কাজ নেওয়ার আগে কুবের তো তাকে শুধু সঙ্গতিপন্ন বলিয়া জানিত, অসংখ্য উৎস হইতে হোসেনের যে কত টাকা আসে এখন ভাবিতে গেলে কুবেরের মাথা ঘোরে! সে আর গণেশ শুধু জানিয়াছে, কেতুপুরের আর কেহ হোসেন মিয়ার রহস্য জানে না।

টাকাওয়ালা মানুষের সঙ্গে মেশে না হোসেন, তাদের সঙ্গে সে শুধু ব্যবসা করে, মাল দিয়া নেয় টাকা, টাকা দিয়া নেয় মাল। মাঝিরা তাহার বন্ধু। অবসর সময়টা সে পদ্মার দীন-দরিদ্র মাঝিদের সঙ্গে গল্প করিয়া কাটাইয়া দেয়। টাকায় ফাঁপানো ব্যাগ পকেটে নিয়া বর্ষার রাত্রে জীর্ণ চালার তলে চাটাইয়ে শুইয়া নির্বিবাদে ঘুমাইয়া পড়ে।

সেদিন রাত্রে মালা ফিরিল না।

পরদিন বেলা বারোটার সময় হাতের ভরে দুলিয়া দুলিয়া সে গৃহে প্রবেশ করিল। নদীর ঘাট হইতে এতটা পথ এমনিভাবে আসিতে কাপড়খানা তাহার কাদামাখা হইয়া গিয়াছে। কুবের খাইতে বসিয়াছিল, একবার চাহিয়া আবার খাওয়ায় মন দিল। ঘরে গিয়া কাপড় বদলাইয়া মালা দাওয়ায় আসিয়া বসিল। কুবের চোখ তুলিয়া তাকায় না। চড়া গলায় পিসীমাকে আর দুটি ভাত আনিতে বলে।

মালা বলে, অগো শুনছ?

না, কুবের শুনিতে পায় ন, বধির হইয়া গিয়াছে।

মালা বলে, তুমি ত নিলা না, রাসুর লগে তাই হাসপাতাল গেছিলাম। গোসা নি করছ?

জবাবের জন্য মালা খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে। তারপর সজল কণ্ঠে বলে, ডাক্তার কয়, পাও সারনের না আমার।

আর কত কথা মালা বলে, কুবের সাড়া-শব্দ দেয় না। খাইয়া উঠিয়া নীরবে তামাক টানিতে থাকে। গোঁয়ার কি সহজ কুবের!

মালা শেষে রাগিয়া বলে, ক্যান মাঝি ক্যান, এত গোসা ক্যান? কবে কই নিছিলা আমারে, চিরডা কাল ঘরের মধ্যি থাইকা আইলাম, এউককা দিনের লাইগা বেড়াইবার যাই যদি, গোসা করবা ক্যান?

যা, বেড়া গিয়া কত্তার লগে— হারামজাদী, বদ্!

কী কইলা মাঝি, কী কইলা?

তারপর কী কলহই দুজনে বাধিয়া গেল। প্রতিবেশীরা ছুটিয়া আসিল, দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল মজা। শেষে রাগের মাথার কুবের হঠাৎ কলিকাটা মালার গায়ে ছুঁড়িয়া মারিল। কলিকার আগুনে মালা ও তাহার কোলের শিশুটির গা স্থানে স্থানে পুড়িয়া গেল, কাপড়েও আগুন ধরিয়া গেল মালার। সিধুর বোন ছুটিয়া আসিয়া কাপড়খানা টানিয়া লইল, নিজের কাপড়ের আঁচল দিয়া লজ্জা নিবারণ করিল মালার। দুঃখিনী সে, বড় ছেঁড়া তার কাপড়খানা।

স্ত্রী-পুরুষে ভিড় করিয়াছে অঙ্গনে, তাহাদের সামনে পঙ্গু অসহায় স্ত্রীর এই দশা, মালার দুরবস্থায় আমোদ পাইয়া সকলে হাসিয়াছে, কে যেন হাততালি দিল। এতক্ষণে চমক ভাঙ্গিল কুবেরের। লাফাইয়া দাওয়া হইতে নামিয়া গাল দিতে দিতে সকলকে সে বাড়ির বাহির করিয়া দিয়া আসিল। তারপর নিজের একখানা কাপড় আনিয়া দিল মালাকে।

ক্রমে ক্রমে শীত কমিয়া আসিল।

কেতুপুর গ্রাম ও জেলেপাড়ার মাঝামাঝি খালটা শুকাইয়া গিয়াছে। পদ্মার জলও কমিয়াছে অনেক। ক্রমে ক্রমে মাঠগুলি ফসল-শূন্য হইয়া খাঁ খাঁ করিতে লাগিল, পায়েচলা পথগুলি স্পষ্ট ও মসৃণ হইয়া আসিয়াছে অনেকদিন আগে। আমগাছে কচিপাতা দেখা দিয়াছে। দেখিতে দেখিতে পাখির সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে দেশে। ঝাঁক বাঁধিয়া বুনো হাঁসের দলকে উড়িতে দেখা যায়। উত্তরাভিমুখী নৌকাগুলো দক্ষিণের জোরালো সমগতি বাতাসে বাদাম তুলিয়া তরতর করিয়া ভাসিয়া যায়, দূরে গেলে অতিথি হাঁসগুলির মতই রহস্যময় মনে হয় তাদের। মাছ দুধ

সস্তা হইয়াছে, পদ্মার চর হইতে কলসীভরা দুধ আসিয়া বাজারে চার পয়সা সেরে বিকাইয়া যায়।

শীতে কুঁকড়ানো গ্রামগুলো গা মেলিয়াছে। সকাল সন্ধ্যায় কাপড় ভাঁজ করিয়া লখা ও চণ্ডীর শরীর ঢাকিয়া গলায় বাঁধিয়া দেয় না, খালি গায়েই তাহারা শুকনো ডোবা পুকুরের কাদা ঘাঁটিয়া মাছ ধরিতে যায়, ফাটা চামড়া উঠিয়া দিয়া ত্বক মসৃণ হইয়া আসিতেছে সকলের, মালার রঙ যেন আরও ফরসা হইয়া আসিয়াছে, একমুষ্টি যৌবন যেন অতিরিক্ত আসিয়াছে মালার দেহে। মালাকে চাহিয়া রাত্রে কুবেরের ঘুম ভাঙ্গে ঃ কোনদিন গৃহে, কোনদিন পদ্মার বুকে।

রাসুর সঙ্গে গোপীর বিবাহের বন্দোবস্ত কিন্তু হইয়া গিয়াছে বাতিল। এ কীর্তিও হোসেন মিয়ার। সোনাখালির একটি পাত্র হোসেন ঠিক করিয়া দিয়াছে গোপীর জন্য, নাম তার বঙ্কু, বয়স বেশী নয়। এ জগতে বঙ্কুর আপনার কেহ নাই বটে, কিন্তু হোসেন মিয়া আছে। হোসেন মিয়া যার মুরুব্বি, কাসের অভাব তার? বঙ্কু পাঁচ কুড়ি টাকা পণ দিবে কুবেরকে, গোপীকে গহনা দিবে তিনকুড়ি টাকার, আর একদিন জেলেপাড়ার সকলকে দিবে ভোজ।

এ কথা জানিতে কুবেরর বাকি নাই যে বিবাহের পর নবদম্পতিকে হোসেন ময়নাদ্বীপে লইয়া যাইবে, কিন্তু জানিয়া কী লাভ? হোসেন মিয়ার অবাধ্য কুবের কেমন করিয়া হইবে? তাছাড়া পাঁচকুড়ি টাকার মায়া ত্যাগ করিবার সাধ্য কুবেরের নাই। বিবাহ দিলে মেয়ে পরের ঘরে যায়, কাছে অথবা দূরে। গোপী না হয় যাইবে দূরে—অনেক দূরের ময়নাদ্বীপে। হয়তো কখনো একটু মন কেমন করিবে কুবেরের। কিন্তু তার প্রতিকার কী? মনে তো অনেক কারণেই কেমন করে মানুষের।

খবর শুনিয়া রাসু গালাগালি করিয়া গিয়াছে। বলিয়াছে, কথা দিয়া কথা রাখিল না কুবের, কুবেরের সে সর্বনাশ করিয়া ছাড়িবে। যুগীকে গিয়া রাসু বুঝি ধরিয়াছে, তারপর একদিন শীতল আসিয়া রাসুর স্বপক্ষে খানিকক্ষণ ওকালতি করিয়া গিয়াছে কুবেরের কাছে। বলিয়াছে, টাকা যদি বেশী চায় কুবের, সে তা বলে না কেন! সোনাখালির পাত্র যত টাকা দিতে চায় তাই দিবে রাসু। গ্রামে রাসুর মত পাত্র থাকিতে দূর-দেশে মেয়েকে কুবের পাঠাইবে কেন?

নে? এ কেন'র জবাব দিবার ক্ষমতা নাই কুবেরের। ময়নাদ্বীপে গিয়া গোপীকে বাস করিতে হইবে ভাবিলে জালে আবদ্ধ ইলিশ মাছের মত মাঝে মাঝে তারও মনটা কি ছটফট করে না? তবু তাকে এসব বলা মিছে।

একদিন গোয়ালন্দে অধরের সঙ্গে কুবেরের দেখা হইয়া গেল। অধর বলিল, কয়েকদিন আগে কটিলা চরডাঙায় আসিয়াছে, কিছুদিন থাকিবে। বাড়ি ফিরিয়া কুবের সেদিন মালাকে বড় দরদ দেখায়। বলে, মালা কতবার বাপের বাড়ি যায় নাই, ইচ্ছা করে না যাইতে? ইচ্ছা যদি হয় তবে না হয় চলুক মালা কাল, দু-চারদিন থাকিয়া আসিবে। মালা বলে, না, বাপের বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা তাহার নাই। বাপ কি যাইতে বলিয়াছে তাকে? এতকাল সে যায় নাই একবার কি দেখিতে আসিয়াছে তাকে? মালা কাঁদ-কাঁদ হইয়া যায়। বরে, তার মনটা শুধু পোড়ায় বাপ-ভাইয়ের কথা ভাবিয়া, তার জন্য ওদের কারো দরদা নাই। কেন সে যাইবে বাপের বাড়ি যাচিয়া? কুবের বিপন্ন হইয়া বলে, গেলে দোষই বা কী? বাপের বাড়ি তো বটে, যাচিয়া বাপের বাড়ি যাইতে কারো লজ্জা নাই। কালই চলুক মালা, দুদিন একদিন পরেই ফিরিয়া আসিবে।

এবার মালা সন্দিগ্ধ হইয়া বলে, যাওনের লাইগা জিদ কর ক্যান মাঝি?

জিদ কিবা? দরদ কইরা কইলাম, জিদ।

মালার উপর রাগের সীমা থাকে না কুবেরের । চরডাঙা যাওয়ার আর তো কোন ছুতা তাহার নাই! জামাই অকারণে শ্বশুরবাড়ি গেলে দোষ অবশ্য কিছুই হয় না, কিন্তু এখন কপিলা ওখানে আছে, হঠাৎ কুবেরের আবির্ভাব ঘটিলে কে জানে কী ভাবিয় বসিবে। বসিয়া বসিয়া কুবের উপায় চিন্তা করে ক্রুদ্ধ চোখে মালার দিকে থাকিয়া তাকায়। হ, আজ বসন্তের আদর্শ

আবহাওয়া আসিয়াছে, কেতুপুরে দোলের উৎসব হইবে কাল, লখা ও চণ্ডী আবির কিনিয়া আজই অঙ্গনে খানিক ছড়াইয়াছে।

বিকালে পদ্মার ঘাটে নৌকার তদ্বির করিতে গিয়া কুবেরের আরও মন কেমন করিতে থাকে। কাব্যের মসৃণ মার্জিত মন-কেমন-করা নয়, তার ভীরু প্রকৃতির সঙ্গে যতখানি খাপ খায় ততখানি দুরন্ত মানসিক অস্থিরতা। পেট ভরিয়া খাইতে পাইয়া শরীরটা কুবেরের ভাল হইয়াছে— খাদ্য যতটুকু শক্তি দিত আগে ব্যয় করিতে হইত তার দশগুণ, এখন সেটা শুধু বন্ধ হয় নাই, বিশ্রামও জুটিয়াছে অনেক। মনেরও যেন তাতে ব্যাকুল হওয়ার ক্ষমতা বাড়িয়াছে এবং কমিয়া গিয়াছে দুর্বল অভিমান, সিদ্ধি বা আপিমেয় নেশার মত আগে যা কুবেরের মনকে অনেকটা শান্ত করিয়া রাখিত। নৌকায় বসিয়া কুবের যেন ভুলিয়া যায় যত নিষ্ঠুরতা করিয়াছে কপিলা, যত দুর্বোধ্য নির্মম খেলা করিয়াছে তার সঙ্গে। মনে পড়ে শুধু কপিলাকে, কপিলার লীলা-চাপল্য, কপিলার হাসি ও ইঙ্গিত, তেলে-ভেজা চুল ও কপাল আর বেগুনি রঙের শাড়িখানি। আর মনে পড়ে শ্যামদাসের উঠানে ভোরবেলা গোবর লেপায় রত কপিলাকে, মালাকে বলিবার অনুরোধ মেশানো তার শেষ সকাতর কথাগুলি। ক্যান আইছিলা মাঝি, জিজ্ঞাসা করিয়াছিল না কপিলা? হ, ও জিজ্ঞাসার মানে কুবের বোঝে। আবার তাই যাইতে চায় কুবের কপিলার কাছে, এখনি যাইতে চায় শস্যহীন শুকনো মাঠগুলি ঊর্ধ্বশ্বাসে পার হইয়া চরডাঙায় কপিলা যেখানে চুল বাঁধিতেছে।— কুবেরকে দেখিয়া তার বোতলটি কাত করিয়া আরও খানিকটা তেল মাথায় ঢালিবে কপিলাঃ তার উত্তোলিত দুটি বাহু, মুখের ছলনাভরা হাসি, বসিবার দুর্বিনীত ভঙ্গি সব পাগর করিয়া দেবে কুবেরকে। ঘাটে আরও নৌকা আছে, মাঝি আছে। এখানে থাকিতে ভাল লাগে না কুবেরের, বাড়ি ফিরিতেও ইচ্ছা হয় না। নদীর ধারে ধারে সে হাঁটিতে আরম্ভ করে, ভাঙিয়া পড়ার জন্য প্রস্তুত তীরের ফাটল-ধরা অংশগুলির উপর দিয়া। চলিতে চলিতে এক সময়ে দশ-বারো হাত ডাঙা তাকে সঙ্গে করিয়া ধ্বসিয়া পড়ে নচি, শীতের পদ্মার জল যেখান হইতে হাত পনেরো পিছাইয়া গিয়াছে। মাটির একটা চাপড়াই বুঝি কোথায় ঘা দিয়া কুবেরকে অজ্ঞান করিয়া দেয়। মিনিট দশেক পরে চেতনা হয় কুবেরের। প্রথমে কুবেরের মনে হয় এ বুঝি কপিলারই এক কৌতুক! তারপর কষ্টে উঠিয়া বসিয়া সে নিঝুম হইয়া থাকে—শেষ বেলায় সূর্য যেন পদ্মাকেও নিঝুম করিয়া দিয়অছে, দূরের নৌকাগুলি এবং আরও দূরে স্টীমারটি যেন হইয়া গিয়াছে গতি-হারা। বাতাসের জোর নাই, নদীর ছলাত ছলাত শব্দ যেন ক্লান্ত। নিজের এলোমেলো চিন্তাগুলিকে কুবের ভাল বুঝিতে পারে না। মাথার মধ্যে একটা ভোঁতা বেদনা টিপটিপ করিতেছে। মাথার বাঁ পাশটা দিয়া একটু রক্তও পরিয়াছে? তাই বলিয়া কেবলি এখন মনে আসিতে থাকিবে কেন গণেশের সেই গান—পিরীত করিয়া জ্বইলা মলাম সই, আ লো সই? কার সঙ্গে পিরীত করিয়া জ্বলিয়া মরিতেছে কুবের? কপিলার সঙ্গে? হ, ভারি মেয়েমানুষ কপিলা! তার সঙ্গে আবার পিরীত! ছেলেমানুষ নাকি কুবের?

পদ্মার স্নান করিয়া কুবের বাড়ি ফিরিল। ভাত খাইতে বসিয়া হঠাৎ কুবের বলিল, চরডাঙ্গা যাবি লখা?

যামু বাবা, যামু!

কাইল বিয়ানে মেলা দিমু, আঁই?

হ, এ ফন্দি মন্দ নয়। দোলের উঃসবে মামাবাড়ি যাইবে ছেলেরা। একা তো যাইতে পারিবে না তারা, কুবের তাই সঙ্গে যাইবে। কেহ টেরও পাইবে না কিসে কুবেরকে টানিয়াছে চরডাঙাতে।

মালা বলিল, আগো নিয়অ যাইবা ত আমারেও নিয়া চল।

কুবের বলে, না তরে নিমু না। যাবি না কইলি ক্যান?

কুবের বাঁচিয়েছে। মালাকে লইয়া চরডাঙা যাওয়া কি সহজ কথা! রাজি না হইয়া ভালই করিয়াছে মালা, যাতায়াতের ভুলিভাড়াটা কুবেরের বাঁচিয়া গেল।

মালা এখন যাইতে চায়। ছেলেদেরে লইয়া কুবের যদি সত্যসত্যই যায় চরডাঙা তবে আর সে যাইবে না কেন? মালা স্বামীর তোষামোদ আরম্ভ করে। রাত্রে খানিক রাগারাগি কাঁদাকাটা করিতেও ছাড়ে না। কিন্তু কুবের অটল। যাইবে না বলিল কেন মালা? কুবের যখন তোষামোদ আরম্ভ করিয়াছিল বাহাদুরি করিয়া তখন যাইতে অস্বীকার করিল কেন? মরিয়া গেলেও কুবের তো তাকে চরডাঙায় লইবে না। হ, কুবেরের গোঁ মালা জানে না। কী ভাবিয়াছে সে কুবেরকে?

রাত্রি থাকিতে উঠিয়া লখা ও চণ্ডীকে টানিয়া তুলিয়া কুবের রওনা হইয়া গেল। মালা কপাল কুটিয়া যাওয়ার জন্য কাঁদিতে লাগিল, কুবের ফিরিয়াও তাকাইল না। সকাল সকাল তাহারা পৌঁছিল চরডাঙায়। হাঁটিতে হাঁটিতে ছেলে দুটোর পা ব্যথা হইয়া গিয়াছে। চণ্ডীকে মাঝে মাঝে কোলে করিয়া চলিতে হওয়ায় কুবেরের গিয়েছে হাঁপ। শ্বশুরবাড়ির দাওয়ায় বসিয়া গামছা দিয়অ সে ঘাম মুছিতে লাগিল। একটু পরে কপিলা একখানা পাখা আনিয়া দিল। কুবের খুশী হইয়া বলিল, আছস কিবা কপিলা?

কিবা দেখ?

কাহিল য্যান লাগে তরে।

হ, কাহিল হইছি।

কুবের ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, ক্যান রে কপিলা, অসুখ নি করছে তর?

মনডার অসুখ মাঝি, তোমার লাইগা ভাইবা ভাইবা কাহিল হইছি?

বলিতে বলিতে আঁচলের আড়াল হইতে হাত বাহির করিয়া এক ভাঁড় চুন-হলুদ কপিলা কুবের গায়ে ঢালিয়া দেয়। হাসিয়া গলিয়া পড়ে কপিলা। কুবের মূঢ়ের মত চাহিয়া থাকে। আনন্দ অথবা দুঃখ কিসে তাহার রোমাঞ্চ হয় সে বুঝিতে পারে না। কেতুপুরে থাকিবার সময় এমনিভাবে হাসিত কপিলা। আকুরটাকুরে শ্যামাদাসের বাড়িতে এ হাসির আভাসও কপিলার মুখে সে দেখিতে পায় নাই।

কপিলার হাসির শব্দে বৈকুণ্ঠ বাহিরে আসে। লখা ও চণ্ডীকে সঙ্গে করিয়া কপিরা চলিয়া যায় ভিতরে।

শ্যামাদাসের কাছে বৈকুণ্ঠ ময়নাদ্বীপের কথা শুনিয়াছে। সে সেই কথা আরম্ভ করিল। কথায় কুবেরের মন ছিল না, সে অন্যমনে বৈকুণ্ঠের কথার জবাব দিয়া গেল।

রঙ ও কাদা নিয়া গ্রামে দোলের উৎসব চলিয়াছে, রঙের চেয়ে কাদার পরিমাণটাই এ পাড়ায় বেশী। চাষা-ভূষা জেলে-মাঝির পাড়া এটা, এখানে রঙের বড় অনটন। অনেক বেলায় কাদামাখা মূর্তিসমূহের একটা শোভাযাত্রা পাড়া হইতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইল। গাধার মত ক্ষুদ্রকায় একটা ঘোড়ার উপরে বিচিত্র সাজে দোলের রাজা অতিকষ্টে বসিয়া আছে, গলায় তাহার ছেঁড়া জুতোর মালা, গায়ে গোটা দশেক ছিন্ন-ভিন্ন জামা, চারিদিকে লড়বড় করিয়া ঝুলিতেছে অনেকগুলি ছেঁড়া ন্যাকড়া। সামনে দিয়া যাওয়ার সময় শোভাযাত্রার লোকেরা কুবের, বৈকুণ্ঠ ও অধরকে কাদা মাখাইয়া দিয়া গেল, অধর ভিড়িয়া গেল দলে। তাথৈ নাচে, ছুটাছুটি হৈ চৈ, ডোবা পুকুরের পাঁক তুলিয়া যাকে খুশী ছুঁড়িয়া মারা-আনন্দ বটে দোলের! খানিক ইতস্তত করিয়া লখা ও চণ্ডী অধরের সঙ্গে যোগ দিবার জন্য ছুটিয়া গেল, কুবেরের বারণ কানেও তুলিল না।

কাদা ধুইয়া স্নান করিয়া আসিবার উদ্দেশ্যে কুবের গেল পুকুরে। কপি! বুঝি টের পাইয়াছিল। খানিক পরে সেও পুকুরঘাটে আসিয়া হাসির।

আমারে রঙ দিলা না মাঝি?

পাক দিমু কপিলা? রঙ ত নাই!

দূর অ! রঙ নাই, পাক দিবার চায় দিও না মাঝি পাক, দিও না কইলাম!

পাক দিতে বারণ করে কপিলা কিন্তু পা পিছলাইয়া কাদা মাখিয়া জলে সে গড়াইয়া পড়ে।

হাতের ঠেলায় কলসী ভাসিয়া যায় কুবেরের দিকে। কপিলা বলে ধর মাঝি, কলস ধর।

বলে, আমারে ধর ক্যান? করস ধর।

হ, ভীত চোখে চারিদিকে চাহিয়া কলসীর মতই আলগোছে কপিলা ভাসিয়া থাকে, তেমনি ত্রাসের ভঙ্গিতে স্তনদুটি ভাসে আর ডোবে। চোখের পলকে বুকে কাপড় টানিয়া হাসিনার ভান করিয়া কপিলা বলে, কথা যে কও না মাঝি?

কুবের বলে, তর লাইগা দিবারাত্র পরানডা পোড়ায় কপিলা।

কপিলা চোখ বুজিয়া বরে, ক্যান মাঝি ক্যান? আমারে ভাব ক্যান? সোয়ামীর ঘরে না গেছি আমি? আমারে ভুইলো মাঝি—পুরুষের পরান পোড়ে কয়দিন? গাঙের জলে নাও ভাসাইয়া দূর দ্যাশে যাইও মাঝি, ভাইলো আমারে। ছাড়, মানুষ আহে।

সাঁতার দিয়া কপিলা কলসী ধরিয়া আনে। কাপড় ঠিক করিয়া ভরা কলসী কাঁখে তুলিয়া পিছল ঢালু পাড় বাহিয়া উপরে উঠিয়া যায়। হ, ফিরিয়া একবার তাকায় কপিলা। ভরা কলসীর জল খানিকটা উছলাইয়া পড়ে।

দুপুরে খাইয়া উঠিয়া কুবের বলে, লখা, চণ্ডী, ল মেলা করি। দিনে দিনে দাঁয় ফিরুম।

মালা বিস্মিত হইয়া বলিল, আজ ফিরা আইলা যে?

মাইনষে থাকে তর বাপের বাড়ি?

পথ হাঁটিয়া লখা ও চণ্ডী আধমরা হইয়া গিয়াছিল। কুবেরও কম শ্রান্ত হয় নাই। ফিরাইয়া জিরাইয়া গ্রামে পৌঁছতে তাহাদের সন্ধ্যা পার হইয়া গিয়াছিল। লখা ও চণ্ডী দুটি ভাত খাইয়া শুইয়া পড়িল। কপিরা চরডাঙায় আসিয়াছে তাদের মুখে এ খবর শুনিয়া মালা গম্ভীর হইয়া গেল। কুবেরকে আর সে কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না। খোঁড়া পা'টি টান করিবার চেষ্টাতেই বোধহয় একবার তাহার মুখখানা হইয়া গেল বিকৃত। কপিলা চলিয়া যাওয়ার পর হইতে নিজের পঙ্গুতা সম্বন্ধে মালা সচেতন হইয়া গেল বিকৃত। কপিলা চলিয়া যাওয়ার পর হইতে নিজের পঙ্গুতা সম্বন্ধে মালা সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। কুঁকড়ানো শীর্ণ পা'টিতে সে মাঝে মাঝে সিধা করিবার চেষ্টা করে, দুহাতে মাঝে মাঝে পা'টিতে ঘষিতে থাকে সজোরে। জন্ম হইতে অভ্যস্ত বিকলাঙ্গটি এতকাল পরে মালাকে বিশেষভাবে কাতর করিয়াছে।

বাড়ির দক্ষিণে খানিকটা ফাঁকা জমি ছিল। গোপীর বিবাহের আগে ওখানে একখানা ঘর তুলিবার কথা ভাবিতেছিল কুবের। এতকাল সময় ছিল না, হোসেনের চালানী কারবারে এখন একটু মন্দা পরিয়াছে। বাড়িতে থাকিবার সময় পায় কুবের। চরডাঙা হইতে ফিরিবার পরদিন সে ঘর তুলিবার জন্য বাবুদের অনুমতি আনিতে গেল।

কুবের কি জানিত অনুমতির জন্য মেজবাবুর কাছেই তাহাকে দরবার করিতে হইবে! নীচু হইয়া প্রণাম করিয়া জোড়হাতে মেজবাবুর সামনে দাঁড়াতেই হইল কুবেরকে। করুণ কণ্ঠে জানাইতে হইল আবেদন। ঘর তুলিবে কুবের? মেজবাবু হাসিয়া কথা বলেন। ফরাসের সামনে মেঝেতে উবু হইয়া বসিবার অনুমতি কুবের পায়, কিন্তু যুক্তকর মুক্ত করিবার নিয়ম নাই। জেলেপাড়ার খবর জিজ্ঞাসা করেন মেজবাবু! কে কেমন আছে? কার কেমন অবস্থা, কী রকম মাছ পড়িতেছে এ বছর। জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে একদিন মেজবাবুর যাতায়াত ছিল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নীতির জ্ঞান বিতরণ করিয়া মাঝিদের জীবনগুলি উন্নততর করিবার ঝোঁকে তিনি আভিজাত্য ভুলিয়াছিলেন। শিক্ষা মাঝিরা পায় নাই, মাঝিদের বৌ-ঝিরা শুধু পাইয়াছিল দুর্নাম, গ্রামে গ্রামে খবর রটিয়াছিল যে কেতুপুরের মেজকর্তা জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে রমণী চাখিয়া বেড়াইতেছেন—জেলেপাড়া মেজব্যবুর প্রণয়িনীর উপনিবেশ। আজ আর জেলেপাড়ার দিকে যাওয়ার সময় মেজবাবু পান না। মাঝিদের কারো সঙ্গে দেখা হইলে খবর জিজ্ঞাসা করেন। সকারে দুপুরে জেরেপাড়ার ভাঙা কুটিরে গিয়া সময় যাপন করিবার সময়ও যে দুস্তর ব্যবধান মাঝিদের সঙ্গে মেজবাবুর থাকিয়া গিয়াছিল, কোন মন্ত্রে তাহা ঘুচিবার নয়। মাঝিরা বিব্রত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, ভাল করিবার খেয়ালে বড়লোক কবে গরীবের হৃদয় জয় করিতে

পারিয়াছে? মেজবাবু তো হোসেন মিয়া নন। দুর্নীতি, দারিদ্র্য, অন্তহীন সরলতার সঙ্গে নীচু স্তরের চালাকি, অবিশ্বাস ও সন্দেহের সঙ্গে একান্ত নির্ভর, অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে ধর্মকে অনায়াসে সহিয়া চলা—এসব যাদের জীবনে একাকার হইয়া আছে, পদ্মার বুকে নৌকা ভাসাইয়া যারা ভুবুক করি, ডাঙায় যারা গরীব ছোটলোক, মেজবাবু কেন তাদের পাত্তা পাইবেন? ও কাজ হোসেন মিয়ার মত মানুষের পক্ষে সম্ভব, মেজবাবুর চেয়ে বেশী টাকা রোজগার করিয়াও যার মাঝিত্ব খসিয়া যায় নাই।

মালা? মালার কথাও মেজবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন। মলায় পায়ের যে চিকিৎসা চলিতেছিল কী হইল তার? তারপর ফাঁকা জমিটুকুতে ঘর তুলিবার অনুমতি দিয়া কুবেরকে মেজবাবু বিদায় দিলেন।

মালা আজও মুখ ভার করিয়াছিল। কিন্তু কৌতূহল দমন করা যায় না।

কী কইল মাইজা কত্তা?

কী কইব? তোর কথা জিগাইল।

হ?

না তুইলা আবার তরে হাসপাতালে নিয়া যাইব কইল গোপীর মা।

গোঁয়ার সহজ কুবের! গোঁ ধরিলে আর তো সে তাহা ছাড়িবে না? মেজবাবুর নৌকায় মালা যে আমিনবাড়ি গিয়াছিল, কতকাল সে একথা মনের মধ্যে পুষিয়া রাখিবে সেই জানে, হয়তো মালা যখন বুড়ি হইয়া যাইবে, বিকল পাটির মত সর্বাঙ্গ শীর্ণ হইয়া আসিবে তাহার তখনও একথা ভুলিবে না কুবের। কলহ করিয়া মালা কাঁদে। মৃত্যু কামনা করে নিজের। কিন্তু এ বিষয়ে কুবের কঠোর নির্মম। অন্য বিষয়ে মালার সঙ্গে তাহার ব্যবহার বদলায় না, পঙ্গু অসহায় স্ত্রীর জীবন তারই বক্ষের আশ্রয়ে আজো উথলিয়া ওঠে, আমিনবাড়ি যাওয়ার জন্য অম্লানবদনে মালাকে সে পীড়ন করে। আজ রাত্রেই হয়তো কুবের মালাকে বুকের জড়াইয়া মিঠা মিঠা কথা বলিবে, পদ্মার ঠাণ্ডা বাতাসে জুড়াইয়া জুড়াইয়া কি যে মধুর হইয়া উঠিবে কুবেরের ব্যবহার! কাল হয়তো আবার সে কাঁদাইবে মালাকে মেজবাবুর কথা তুলিয়া। এমনি প্রকৃতি পদ্মানদীর মাঝির, ভদ্রলোকের মত একটানা সঙ্কীর্ণতা নয়, বিরাট বিস্তারিত সংমিশ্রণ।

ঘর তোলা শেষ হইতে দিন দশেক সময় লাগিল। তারপর একদিন বঙ্কুর সঙ্গে বিবাহ হইয়া গের গোপীর।

কপিলা আসিল বিবাহের কাজ করিবে কে? মালা তো পঙ্গু।

কুবের খুশী হইয়া বলিতে লাগিল, আইছ কপিলা আইছস? কুবের যেন ভুলিয়া গিয়অছে চরডাঙায় পুকুরের জলে কী তাহার হইয়াছিল সঙ্গে। কিন্তু কপিরা সব মনে পড়াইয়া দেয়। সরিয়া সরিয়া পলাইয়া বেড়ায় কপিলা, ঢেঁকিঘরের ভিতরে দাঁড়াইয়া কুবের ইশারা করিয়া কাছে ডাকিলে মুখ ঘুরাইয়া থাকে। এ তো ছলনা নয়, খেলা নয় কপিলার। কী যেন ভাবিয়া আসিয়অছে কপিলা এবার, বড় সে গম্ভীর। একটু হাসি, দুটি কথার কাঙাল কুবের, কপিলার হাসি কই? কথা কই কপিলার মুখে?

হলুদ মাখিতে মাখিতে হলদে হইয়া বিবাহ হইয়া গেল গোপীর। বরকনেকে কুবের পদ্মার নৌকায় তুলিয়া দিল। গোপী আবার ফিরিয়া আসিবে। হোসেন মিয়ার তাড়াতাড়ি নাই?। বঙ্কু ও গোপী দু-মাস দেশে থাক, তাতে সে আপত্তি করিবে না।

বিবাহের পরই কপিলার ফিরিয়া যাওয়ার কথা ছিল, কী ভাবিয়া সে রহিয়া গেল। কদিন পর শ্যামাদাস আসিয়া তাকে আকুরটাকুর লইয়া যাইবে। দিন দুই পরে কুবেরকে হোসেন মিয়ার একটা চালান আনিতে যাইতে হইল। মাইল দশেক উজানে একটা গ্রামের ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া সে পাট বোঝাই করিল নৌকায়। তারপর দেবীগঞ্জে ফিরিয়া আসিল অনেক রাত্রে।

সকলে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অতরাত্রে কেতুপুরে ফিরিতে রাজী হইল না। কুবেরর মন পড়িয়াছিল বাড়িতে! নদীর ধারে ধারে সে হাঁটিতে আরম্ভ করিল গ্রামের দিকে। নদীতে জেলে-

নৌকার আলোগুলি ইতস্তত সঞ্চারিত হইয়াছে, মাছা ধরিবার কামাই নাই পদ্মার! চলিতে চলিতে কত কি ভাবে কুবের। কারো ঘুম না ভাঙাইয়া কপিলাকে কি তোলা যাইবেনা? আর কিছু চায় না কুবের কপিলার কাছে, গোপনে শুদু দুটা সুখ-দুঃখের কথা বলিবে। একটু রহস্য করিবে কপিলার সঙ্গে। বাঁশের কঞ্চির মত অবাধ্য ভঙ্গিতে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কপিলা টিটকারি দিবে তাকে, ধরিয়া নোয়াইয়া দিতে গেলে বসিয়া পড়িবে কাদায়, চাপা হাসিতে নির্জন নদীতীরে তুলিয়া দিবে রোমাঞ্চ।

আর কিছুই কুবের চায় না।

কেতুপুরের ঘাটে পৌছাইয়া কুবেরের বুকের মধ্যে হঠাৎ কাঁপুনি ধরিয়া গেল, গলা শুকাইয়া গেল কুবেরের। স্পষ্ট সে দেখিতে পাইল সাদা কাপড় পরিয়া এতরাত্রে একটি রমণী ঘাটে দাঁড়াইয়া আছে। কোন দিকে মানুষের সাড়া নাই, পদ্মার জল শুধু ছলাত ছলাত করিয়া আছড়াইয়া ভাঙা তীরকে ভাঙিবার চেষ্টা করিতেছে, নদীর জোর বাতাসে সাদা কাপড় উড়িতেছে একাকিনী রমণীর।

ভীত কর্কশ কণ্ঠে কুবের বলিল, কেডা খাড়াইয়া আছ গো, কেডা?

নদীর দিকে মুখ করিয়া রমণী দাঁড়াইয়া ছিল, কুবেরের গলার আওয়াজে চমকাইয়া অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিল। তারপর ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল , কেডা? মাঝি আইলা?

কুবের অবাক হইয়া বলিল, কপিলা? দুপুর রাইতে ঘাটে। কী করস কপিলা।

কপিলা কাছে আসির, বলিল, ডরাইছিলাম মাঝি!

তারপর আরও কাছে আসিল কপিলা, কুবেরের বক্ষের আশ্রয়ে যে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, বড় বিপদ হইয়াছে আজ। আজ বিকালে হঠাৎ পুলিস আসিয়া বাড়ি তল্লাস করিয়াছে কুবেরের, [illegible] পাটখড়ির বোঝার তলে পীতম মাঝির চুরি যাওয়া ঘটিটা পাওয়া গিয়াছে। বাড়ি ফিরিলেই চৌকিদার ধরিবে কুবেরকে। সন্ধ্যার পর চুপিচুপি কপিলা তাই ঘাটে আসিয়া বসিয়া আছে। কুবের ফিরিলে সতর্ক করিয়া দিবে।

কুবের মুখে কথ সরিল না।

অনেকক্ষণ পরে সে বলিল, রাসুর কাম। সব্বোনাশ করব কইছিল না রাসু— রাসুর কাম।

কী করবা মাঝি?

কে জানে কী করিবে! বিপদে-আপদে মুখ চাহিবার একজন আছে কুবেরের, তার কাছে গিয়া দাঁড়াইবে। ঘাটে হোসেনের নৌকা বাঁধা আছে দেখিয়া কুবের কুবের একটা আশ্বস্ত হইল।

কপিলার চোখে মুছাইয়া দিল কুবের, বলিল, বাড়িত যা কপিলা।

তুমি কী করবা?

হোসেন মিয়াকে বিত্তান্তে কই গিয়া, দেখি স্যায় কী কয়।

আমি লগে যামু মাঝি।

হ, বাঁশের কঞ্চির মত অবাধ্য কপিলা। কোনমতেই কুবের তাহাকে বাড়ি পাঠাইতে পারিল না। কুবেরের সঙ্গে সে হোসেন মিয়ার বাড়ি গেল।

হোসেনকে কিছু বলিতে হইল না, খবর সে আগেই শুনিয়াছে। লালচে দাড়ি মুঠা করিয়া ধরিয়া সে ভাবিতে ভাবিতে বলিল, ময়নাদ্বীপ যাবা কুবির? চুরি আমি সামাল দিমু।

আমি চুরি করি নাই মিয়া!

তা কি হোসেন মিয়া জানে না? কিন্তু চোরাই মাল যখন বাহির হইয়াছে কুবেরের ঘরে, চোরকে সেখানে মাল রাখিয়া আসিতে কেহ যখন দেখে নাই, কে বিশ্বাস করিবে কুবেরের কথা? বাহিরের কেহ শত্রুতা করিয়া রাখিয়া যাইতে পারে এমন কোন স্থানে মাল বাহির হয় নাই, একেবারে ঘরের মধ্যে লুকানো অবস্থায় মাল পাওয়া গিয়াছে। তাছাড়া, গরিম নয় কুবের?

বিবর্ণ মুখে কুবের মাথা হেঁট করিয়া থাকে।

ঘোমটার ভিতর হইতে সজল চোখে কপিলা তার দিকে তাকায়।

একজন মুনিষ তামাক সাজিয়া দিয়া যায় হোসেনকে। তামাক টানিতে টানিতে হোসেন জিজ্ঞাসা করে, যাবা ময়নাদ্বীপি?

ঘাড় নাড়িয়া কুবের সায় দেয়!

চোখ বুজিয়া হোসেন ব্যবস্থার কথা বলিয়া চলে। আজ এই রাত্রেই রওনা হইয়া যাক কুবের। স্ত্রী-পুত্রের জন্য ভাবনা নাই কুবেরের, হোসেন রহিল। পরে গোপী আর বঙ্কুর সঙ্গে ওদের সকলকে হোসেন ময়নাদ্বীপে পৌছাইয়া দিবে। কেন, কাঁদে কেন কুবের ময়নাদ্বীপ তো নিজের চোখে সে দেখিয়া আসিয়াছে, সেখানে গিয়া বাস করিতে হইবে বলিয়া কান্নায় কী আছে?

তামাক শেষ করিয়া হোসেন উঠিল। বাহিরের একটা ঘরে সাত জন মুসলমান মাঝি ঘুমাইয়া ছিল, তাদের মধ্যে পাঁচজনকে সঙ্গে করিয়া সকাল নদীঘাটের দিকে চলিল। কুবের ও কপিলা চলিতে লাগিল সকলের পিছনে।

কপিলা চুপিচুপি বলে, না গেলা মাঝি, জেল খাট। কুবের বলে হোসেন মিয়া দ্বীপে আমারে নিবই কপিলা। একবার জেল খাইটা পর পামু। ফিরা আবার জেল খাটাইব।

কপিরা আর কথা বলে না।

ঘাটের আর খানিক তফাতে হোসেনের প্রকাণ্ড নৌকাটি নোঙর করা ছিল। একজন মাঝি ঘুমাইয়া ছিল নৌকায়। তাকে ডাকিয়া তুলিলে সে নৌকা তীরে ভিড়াইল। কুবের নীরবে নৌকায় উঠিয়া গেল। সঙ্গে গেল কপিলা।

ছই-এর মধ্যে গিয়া সে বসিল। কুবেরকে ডাকিয়া সে বলিল, আমারে নিবা মাঝি লগে?

হ, কপিলা চলুক সঙ্গে। একা অতদূরে কুবের পাড়ি দিতে পারব না?